ফাহিম রাজিত হোসেনের জন্ম ও বেড়ে উঠা রাজশাহীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এবং রাজশাহী কলেজে সহপাঠীদের মাঝে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ছবি আঁকা নিয়ে শখ ছোট থেকেই কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু ২০১৫ থেকে। ২০১৬ এবং ২০১৭-তে ২ টি আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহনের পর ২০১৮ থেকে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলনেতা হিসেবে। বর্তমানে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যুক্ত আছেন সুইডেনের চাল্মার্স ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে, কাজ করছেন এক্সোপ্ল্যানেট নিয়ে।

মোঃ মাহমুদুন্নবীর জন্ম ও বেড়ে উঠা রাজশাহীতে–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল আর রাজশাহী কলেজের প্রাঙ্গণে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে যাত্রার শুরু ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (IOAA) বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে। ২০১৩ আর ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মানজনক স্বীকৃতির পরে, ২০১৮ সাল থেকে সে বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (BDOAA) একাডেমিক লিড হিসাবে সাথে যুক্ত আছে। বর্তমানে সে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ওয়েইন স্টেট ইউনিভার্সিটি তে ডক্টরেট (পিএইচডি) করছে, গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোল নিয়ে।

9 789849 996378

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যতকিছু
ফাহিম রাজিত হোসেন
মো: মাহমুদুন্নবী
মূল্য : ৯০০. ০০ টাকা
www.tamralipi com

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যতকিছু • ফাহিম রাজিত হোসেন মোঃ মাহমুদুন্নবী

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যতকিছু

অলিম্পিয়াড ও অন্যান্য

ফাহিম রাজিত হোসেন
মোঃ মাহমুদুন্নবী

◇

উৎসর্গ

ফাহিম রাজিত হোসেনের উৎসর্গ
আব্বু-আম্মু এবং ফাল্গুনী

যারা আমার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহকে পরাধীন হতে দেয়নি

মোঃ মাহমুদুন্নবীর উৎসর্গ
আমার আম্মু

যার ছায়ায় এই আমার বেড়ে ওঠা

২০২৫

This book was typeset using LaTeX software.

সূচিপত্র

Preface

১ জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান – Astronomy and Geometry ১

১.১ ভূমিকা . . . ১

১.২ আকাশের জ্যামিতি . . . ৬

১.২.১ কৌণিক আকারের মাপজোখ . . . ৬

১.২.২ আকাশের দেয়ালে জ্যোতিষ্কের অবস্থান . . . ১৩

১.২.৩ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিগন্তসীমা ও উদয় . . . ২৫

১.২.৪ নাক্ষত্রিক লম্বন নির্ণয় . . . ৩২

১.২.৫ আপাত স্থানচ্যুতি . . . ৩৭

১.৩ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা . . . ৪০

১.৩.১ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় সময়! . . . ৪০

১.৩.২ চাঁদ, চন্দ্রকলা – Moon, Lunar Phases . . . ৪৭

১.৩.৩ গ্রহণ – Eclipse . . . ৫৯

১.৩.৪ সৌরকেন্দ্রিক গ্রহ সম্পর্কিত ঘটনা . . . ৭০

১.৩.৫ গ্রহের গতি: ভূকেন্দ্রিক না সৌরকেন্দ্রিক? . . . ৭৭

১.৪ অধ্যায় সারাংশ . . . ৮৬

২ বিকিরণ সূত্রাবলী – Radiation Laws ৮৭

২.১ বর্ণালী এবং বর্ণালী রেখা – Spectra and Spectral Lines . . . ৮৮

২.১.১ কার্শফের সূত্র . . . ৯০

২.১.২ বর্ণালী রেখার উৎপত্তি – Formation of Spectral lines . . . ৯৩

২.২ আলোর গুণগত পরিমাপ . . . ৯৫

২.২.১ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ . . . ১০০

২.২.২ ভিনের সরণ সূত্র . . . ১০৭

২.৩ নাক্ষত্রিক দীপ্তি এবং উজ্জ্বলতা . . . ১১০

২.৩.১ একবর্ণীল দীপ্তি . . . ১১০

২.৩.২ বোলমিতিক দীপ্তি . . . ১১২

২.৪ জ্যোতিষ্ক বিকিরণ ও তাপমাত্রা বিতরণ . . . ১১৬

২.৪.১ সৌরজগতের সদস্যদের বিকিরণ . . . ১১৮

২.৪.২ গ্রিনহাউস মডেল . . . ১৩০

২.৪.৩ ধূলিকণার বিকিরণ . . . ১৩৪

২.৫ অধ্যায় সারাংশ . . . ১৩৯

৩ নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতা পরিমাপ – Stellar Photometry **১৪১**
৩.১ উজ্জ্বলতার মাত্রার স্কেল ১৪১
৩.১.১ পরম ঔজ্জ্বল্য ১৪৩
৩.২ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের কৌশল ১৪৬
৩.৩ আলো থেকে ডেটা ১৫৪
৩.৩.১ ফোটন গণনা ১৫৫
৩.৩.২ আলো পরিমাপে অনিশ্চয়তা ১৫৮
৩.৪ আদর্শ আলোকমিতিক সিস্টেম ১৬৭
৩.৪.১ ফিল্টার সিস্টেম ১৬৭
৩.৪.২ আদর্শ ঔজ্জ্বল্য ব্যবস্থা ১৭০
৩.৫ পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা ১৭৫
৩.৫.১ পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতার একক ১৭৬
৩.৫.২ পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা ও দূরত্ব ১৮২
৩.৫.৩ আকাশের উজ্জ্বলতা ১৮৬
৩.৬ অধ্যায় সারাংশ ১৮৮

৪ নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণ – Stellar Observations **১৯০**
৪.১ টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ১৯২
৪.১.১ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ ১৯৩
৪.১.২ টেলিস্কোপে ইমেজ কেমন দেখা যায়? ১৯৬
৪.২ নাক্ষত্রিক বর্ণ ২০৫
৪.২.১ নাক্ষত্র বর্ণসূচক ২০৬
৪.২.২ বোলমিতিক ঔজ্জ্বল্য এবং সংশোধন ২১৩
৪.৩ নাক্ষত্রিক আলোক বিলুপ্তি ২১৫
৪.৩.১ আন্তঃনাক্ষত্রিক বিলুপ্তি – Interstellar Extinction ২১৬
৪.৩.২ বায়মন্ডলে আলোর বিলুপ্তি ২১৯
৪.৩.৩ Color Excess and Reddening ২২২
৪.৪ আকাশে তারার ঘনত্ব এবং ওলবারের হেয়ালি ২২৬
৪.৫ H-R ডায়াগ্রাম ২৩২
৪.৫.১ H-R Diagram গঠন ২৩৩
৪.৫.২ তারাস্তবকের H-R ডায়াগ্রাম ২৩৮
৪.৬ অধ্যায় সারাংশ ২৪২

Appendices **২৪৩**

A জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে গণিতের হাতিয়ার! **২৪৫**
A.১ অ্যাপ্রক্সিমেশন, অনুমানের সঠিক ব্যবহার ২৪৬
A.১.১ Estimation ২৪৮

A.১.২ ফাংশনের রূপ বদল! ২৫২
A.১.৩ Graphical Approximation ২৫৭
A.২ মাত্রা বিশ্লেষণ – Dimensional Analysis ২৬৪
A.৩ অলিপিয়াডে প্রশ্নের সমাধান ২৭১

B জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধ্রুবক ও একক **২৭৩**

C Suggested Resources **২৮০**

D পরিভাষা **২৮২**

শুরুর কথা...

"মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমী বিস্ময়ে—"

— **রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮**

রাতের তারাভরা আকাশ সেই যুগ যুগ ধরেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। বর্তমানেও সূর্য-চন্দ্রগ্রহণ, ছায়াপথ, তারার জন্ম-মৃত্যু, কৃষ্ণগহ্বর এইগুলো সবার কাছেই অনেক কৌতুহলের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রেই এসবের হালকা কিছু ধারণা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাই। আবার অনেকসময় আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন সাড়া দেয় ঠিকই যার সুন্দর উত্তর খুঁজে পেতে বাগ পেতে হয়। প্রচলিত গল্পকারে লেখা বই পড়ে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। মহাবিশ্বের এবং আমাদের আকাশের বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর বিষয়ের সত্যিকারের সৌন্দর্য্য অনুভব করার জন্য আমাদেরকে এই গল্পগুলোর পেছনের যে গণিত আর বিজ্ঞান আছে, সেটাও জানতে হবে।

এই বইটি তাই তোমাদের জন্যই, যারা মহাকাশের এই গল্পগুলোর সাথে সাথে তার পেছনের গণিত আর বিজ্ঞানটাকেও জানতে চাও। আমরা যখন প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই মনোমুগ্ধকর জগতে পথচলা শুরু করি, তখন অন্যতম প্রধান একটা বাধা ছিল বাংলায় পর্যাপ্ত রিসোর্সের অভাব। সেই শূণ্যতা পূরণের জন্যই আমাদের এই প্রথম প্রয়াস।

এটা ঠিক যে বইটি জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে। যদিও বইয়ের কাঠামো এবং টপিক বাছাই করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্লাসিক পাঠ্যবইগুলোর অনুসরণ করা হয়েছে। তাই বলে কি অলিম্পিয়াডে আগ্রহী না হলে এটা পড়ে বুঝা কঠিন হবে?– না! আমরা চেষ্টা করেছি স্কুল কলেজের জ্ঞান থেকেই বইটিকে এমন ভাবে সাজাতে যেন একজন হাইস্কুলের ছাত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের শিক্ষার্থী সবাই এই বই দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের রাজ্যে চলা শুরু করতে পারে। বইটি ৪ টি অধ্যায়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন শুরুর অধ্যায়ের জ্ঞান এবং তথ্য পরবর্তী অধ্যায়ে প্রয়োগ করা যায়।

১ম অধ্যায়ে আকাশ এবং সৌরজগতের কিছু অতি সাধারণ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২য় অধ্যায় থেকে তারার আলোর বিকিরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে আমরা এই আলো পরিমাপ করি এবং তা বিশ্লেষণ করে কিভাবে আমরা তারাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি।

বইটিতে আমরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় খেয়াল রাখার চেষ্টা করেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে হামেশায় নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সংস্করণ আসছে তাই আমাদের বইটিতে প্রয়োজনীয় স্থানে নোট আকারে বিভিন্ন জার্নাল পেপারের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক নিয়ম আছে যা ব্যবহার করা হলেও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়না কেন হল, কীভাবে হল। আমরা **Astronomical Convention** এবং **Notes** বক্স দিয়ে সেগুলো আলাদা ভাবে বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক টপিকের সাথেই রয়েছে কিছু প্রবলেম, যাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। A ক্যাটাগরির প্রবলেম তুমি সহজেই সমাধান করতে পারবে সূত্র ব্যবহার করে। B ক্যাটাগরির প্রবলেমের জন্য তোমাকে একটু মাথা খাটাতে হবে বা গণিতের চতুর প্রয়োগ করতে হতে পারে যেমন বিভিন্ন প্রতিপাদন। C ক্যাটাগরির সমস্যাগুলো কঠিন। এই ধরনের সমস্যা তোমার সমাধানের স্কিল এবং তুমি বিষয়টিকে কত গভীরে বুঝেছো তা যাচাই করে। এরকম প্রশ্ন তুমি জাতীয় (BDOAA[১]) এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে (IOAA[২])

[১] Bangladesh Olympiad on Astronomy and Astrophysics – https://bdoaa.org/
[২] International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – https://www.ioaastrophysics.org/

প্রায়ই দেখবে। এভাবে একটি প্রশ্নের সমাধান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাও আমরা **মতামত** আকারে আলাদা ভাবে দেখিয়েছি। আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডের প্রসঙ্গে আরেকটা কথা। আমরা চেষ্টা করেছি যে যখন যে অধ্যায়ে যা বুঝানো হয়েছে ঠিক তা সম্পর্কিত IOAA প্রবলেম এর রেফারেন্স দিয়ে দিতে যেমন "**See more:** Year–Theory/Data Analysis-No"। এখানে কোড গুলো হচ্ছে: Theory = T, Data Analysis = D, Planetarium = P এবং Observation = O। এই বইয়ে সরাসরি IOAA এর কোনো প্রবলেম দেওয়া হয়নি কারণ, আমরা চাই তুমি নিজে এই বইয়ের রেফারেন্স থেকে প্রশ্নটি খুঁজে বের করে সমাধান কর, যা তোমার অলিম্পিয়াড প্রিপারেশনে কাজে লাগবেই। তবে একটা ভাল প্রিপারেশনের জন্য অবশ্যই তোমাকে এই বইকে ভিত্তি করে বাইরে থেকেও আরো অনেক পড়াশুনা করতে হবে।

এছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের চিন্তা ভাবনা কীভাবে করা যায় এবং কিছু অতিরিক্ত তথ্য নিয়ে আমরা এই বইয়ের শেষে **Appendix**-এ আলোচনা করেছি।

এই বইয়ের আইডিয়া নিয়ে আমাদের কাজ শুরু হয় প্রায় ৫ বছর আগে, মূলত অলিম্পিয়াডের জন্য লেকচার নোট তৈরী করার সময় থেকে; নাম ছিল এককথায় - ASTROBOOK। শুরুর সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত আসার পিছনে আছে অনেক মানুষের নানামুখী সাহায্য আর অনুপ্রেরণা। এর মধ্যে কয়েকজনের নাম না নিলেই নয়। বইয়ের প্রথম লেটেক ভার্সনে সাহায্য করেছে আমাদের অলিম্পিয়াডের অনুজ **মুজতাহিদ আবরার সিদ্দীকি**। আমাদের ছাত্র **আদনান বিন আলমগীর** আর **বায়েজীদ বোস্তামী** (IOAA-23 পদকজয়ী) বইয়ের প্রুফ রিডিং করতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। পরবর্তীতে ২০২২-২০২৪ বাংলাদেশ দলের প্রতিযোগীদের (বিশেষভাবে: তাসদিক আহমেদ, লাবিব বিন আজাদ, হৃতম সরকার, ফারিয়া মাহমুদ) বিভিন্ন মতামত বইটিকে আরও বেশি সহজপাঠ্য করে তুলেছে। আর বিডিওএএ টিমের সবাই বারবার এই বইয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে প্রতিনিয়ত, তাগাদা দিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার, সাধ্যমত পরামর্শ দিয়েছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা দিতে হয় আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট **অনিকেত সুলে** এবং **গ্রেগ স্ট্যাচোস্কি** স্যারকে। প্রতি বছর IOAA এর সময় তারা বইয়ের খবর নিয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সাধারণের জন্য পাঠ্যসূলভ করা বা টপিকে সিলেকশনে পরামর্শ দিয়েছে। International Board Meeting এ জ্যোতির্বিজ্ঞান কে সহজ করে লেখা আর বিভিন্ন কনভেনশন নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হয়, সেখান থেকেও আমরা অনেক দিকনির্দেশনা পেয়েছি। বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখির অনুপ্রেরণা প্রথমত দীপেন ভট্টচার্য স্যারের লেখা থেকে। পরবর্তীতে বইটাকে বর্তমান অবস্থায় আনতে বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী খান আসাদ স্যার, আনোয়ার সজীব ভাই এবং পদার্থবিজ্ঞানী শামস বিন তারিক স্যারের উপদেশ পথনির্দেশনা দেখিয়েছে, যাদের সবার প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। সাথে সাথে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভিন্ন দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং অলিম্পিয়াডের কোচদের প্রতি – যারা তাদের নোট, প্রশ্ন এবং উপদেশ দিয়ে বিশেষভাবে আমাদের সহায়তা করেছে এবং সাধারণভাবে সারাবিশ্বের সকল জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রেমীদের কাছে মহাবিশ্বের জ্ঞানকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সবশেষে আমাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ, এই পুরো সময় জুড়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য।

– জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই জগতে তোমাকে স্বাগতম! আশা করি আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস তোমাকে এই অসাধারণ মহাবিশ্বকে বুঝতে আরও আগ্রহী করে তুলবে!

মোঃ মাহমুদুন্নবী
ফাহিম রাজিত হোসেন

অধ্যায় ১

জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান – Astronomy and Geometry

"*Astronomy, the oldest of the sciences, has more than renewed her youth. At no time in the past has she been so bright with unbounded aspirations and hopes*"

— **William Huggins**, 1891

১.১ ভূমিকা

জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) হচ্ছে জ্যোতিষ্কের বিজ্ঞান যা আকাশের বিভিন্ন বস্তুর যেমন সূর্য চন্দ্র, তারা-নক্ষত্র, গ্রহ, ধুমকেতু ইত্যাদির আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়েছে এবং বিস্মিত হয়েছে। প্রথমদিকে তাদের জন্য মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি নির্ধারণই ছিল মূল বিষয়। তখন এটা বিশ্বাস ছিল যে আকাশের এসব বস্তুগুলো মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে তাই তারা বিশেষ কিছু সময়ের জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার সম্পর্ক বের করতে শুরু করল। যেমন পঞ্জিকাগুলো সাজানো হত চাঁদের বিভিন্ন কলার ওপর নির্ভর করে এভাবেই ঋতু গণনা শুরু হয়। এখানে বহুল সমালোচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা না বললেই নয়। একসময় জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology) এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান কাছাকাছি ২ টি বিদ্যা ছিল। পরবর্তীতে জ্যোতিষশাস্ত্র যেখানে ভাগ্য গণনা বা কুসংস্কার চর্চার দিকে মনোযোগ দেয় সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দুঃখের বিষয় এখনও অনেকেই এমন আছেন যারা অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন।

মধ্য-যুগে নাবিকদের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা আরো বাড়তে থাকে। এভাবে সংস্কৃতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এমনকি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন গণিত-জ্যামিতির উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের অবস্থান এবং গতি মাপার ক্ষেত্রে জ্যামিতির জ্ঞান হয়ে উঠল অমূল্য। কিন্তু তখনো এদের আসল স্বরূপ ও ব্যাপ্তি উন্মোচিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হতে থাকে। মানুষ ক্রমেই পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে শুরু করে। আর এই জ্ঞান যখন মানুষ মহাকাশে বিচরণশীল বস্তুদের স্বরূপ উন্মোচনে ব্যবহার করে তখন থেকেই জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের জন্ম।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস[১]

অন্যান্য ঐতিহ্যের মতো, বিজ্ঞানের প্রথম দিকের ইতিহাসে জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঠিক সম্পাদনের জন্য স্থানিক ও অস্থায়ী প্রয়োজনীয়তার কারণে জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হয়ে পরে। প্রাচীনকাল থেকেই যে জ্যোতির্বিদরা তাই আকাশ পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। শুরু হয় আমাদের নিজস্ব মহাবিশ্বকে বুঝতে বিভিন্ন তোরঘোর যা থেকে তারা মহাবিশ্বের জ্যামিতি নিয়ে নিজস্ব না-না মতবাদ প্রদান করেন। অনেককে তাদের মতবাদের জন্য বিপদেও পড়তে হয়। তৎকালীন জ্যোতির্বিদদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ছিল কিছু অনুমানের উপর ভিত্তি করে–

- বৃত্ত এবং গোলক অন্যান্য জ্যামিতিক আকার থেকে বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করা হত। এ কারণে স্বর্গীয় অঞ্চলের আকার গোলকীয় বলে যুক্তি দেখানো হয়, এবং একই ভাবে পৃথিবীর আকারও গোলাকার বলে মত দেয়া হয়। পণ্ডিতদের মতে গ্রিক দেবদেবী বিভিন্ন নিখুঁত আকার দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

God's Architecture is perfect!

- পৃথিবী স্থির এবং আকাশ (খ-গোলক) পৃথিবীকে আবর্তন করছে। গ্রহগুলো সমকেন্দ্রীয় বিভিন্ন গোলকের শেলে অবস্থান করে পৃথিবীকে আবর্তন করছে (Geocentric Model)।

এই ধারণাগুলো মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায় যেমন জ্যোতিষ্কগুলোর উজ্জ্বলতা ধ্রুব নয়, মাঝে মধ্যেই দেখা যায় গ্রহগুলোর 'স্বর্গীয় বাতির আলো' কমবেশি হতে দেখা যায়। আবার গ্রহদের গতি বা প্রতীপগতির (রাশিচক্রে লক্ষিত গ্রহসমূহের ক্ষণকালীন বিপরীতমুখী গতি) কারণ কি হতে পারে তারা তাদের জ্যামিতির জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। এরকম কয়েকটি ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

এপ্রসঙ্গে আমরা পুরোনো ইতিহাসের কথায় ফিরে যাব। টলেমির কথা বলব– ক্লডিয়াস টলেমি। খ্রিস্টীয় দুই শতকের চরিত্র। ৯০ থেকে ১৭০ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। আলেক্সান্ডারের মৃত্যু হলে তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পিত হয় তিন সেনাপতির কাঁধে। মিশরের দায়িত্ব পড়ে টলেমির উপর। গুণীজন মাত্রই জ্ঞানের কদর করেন। টলেমি সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন সেসময়কার বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার, আলেক্সান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের উপর অনেক কাজ করেছেন। তবে তার সবচেয়ে ভালোবাসার বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। তেরো খণ্ডে একটা বই লিখেছিলেন টলেমি। নাম 'অ্যালমাজেস্ট'। তৎকালীন আরবীয় পণ্ডিতরা এই বইকে বলতেন 'Al Megiste' (the Great One) সেই থেকেই বইয়ের নামটি থেকে গেছে। বলাই বাহুল্য পশ্চিমা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তখন এটি। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কত কথা রয়েছে সেখানে। অনেক তারার কথাও লিখেছেন। ইকুয়্যান্ট (Equant) নামক একটি জ্যামিতিক ধারণা প্রয়োগ করে গ্রহসমূহের গতিবিধির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তেরো নাম্বার খণ্ডে টলেমি এক ধরনের ব্রহ্মান্ড পরিকল্পনা পেশ করেন। কেমন সেই ব্রহ্মান্ড? পৃথিবী মাঝখানে রয়েছে। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, ও শনি তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে আমরা বলছি টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব 'Geocentric Universe'। এই মডেলে তিনি বলেন গ্রহগুলা[২] ঘুরে ছোট একটা বৃত্তে যাকে বলা হচ্ছে *Epicycle* বাংলায় মন্দবৃত্ত এবং Epicycle এর কেন্দ্র ঘুরে আরেকটি বৃহৎ বৃত্তে যার নাম *Deferent* যার কেন্দ্রে হবে পৃথিবী। শীঘ্রবৃত্ত (ইংরেজিতে deferent; গ্রিক fero $\varphi\varepsilon\rho\omega$ 'বহন করা', এবং ল্যাটিন ferro, ferre, 'বহন করা', শব্দের সমন্বয়) হল পৃথিবীর চারদিকে গ্রহকে

[১]জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরো কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর অবদান অপরসীম। আমরা এই বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টারে আলাদা ভাবে তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। ৩য় অধ্যায়ে হিপারকাস এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষ করে টাইকো ব্রাহে এবং ইয়োহানেস কেপলারকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[২]যদিও তিনি প্রথম এই মডেল প্রস্তাব করেননি।

বহনকারী চক্রাকার পথ। এই ব্যবস্থা উৎকেন্দ্রিক মডেলের অনুরূপ ফলাফল দিতে সক্ষম, যা *অ্যাপোলোনিয়াসের* উপপাদ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। টলেমি এ পুস্তকে গ্রহগুলোকে নিম্নলিখিত অনুক্রমে সাজিয়েছেন (যা টাইকো ব্রাহে এবং কোপার্নিকাসের নির্মিত সৌরকেন্দ্রিক মডেলের বিকাশের আগ পর্যন্ত অবিকৃত ছিল): চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, স্থিত তারকারাজি যা আমরা চিত্র ১.১-এ তুলে ধরেছি।

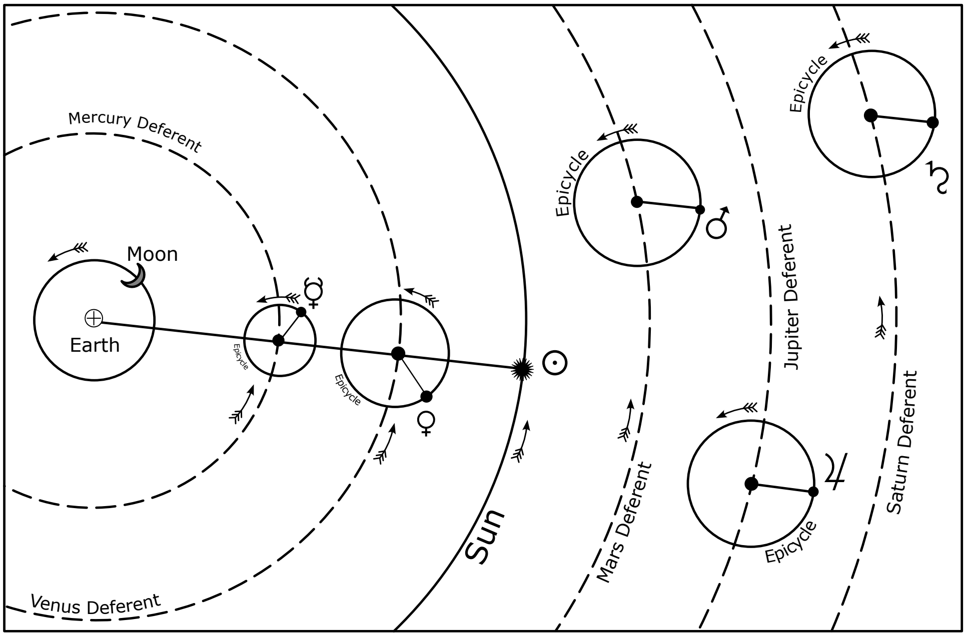

চিত্র ১.১: সৌরজগতের টলেমিক মডেল

টলেমিক মডেলে ধরা হয় গ্রহগুলো উভয় বৃত্তে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে (anticlockwise) ঘুরছে। লক্ষ্য করা যায় পৃথিবী কিন্তু এই মডেলে একদম কেন্দ্রে নাই একটু ভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। গ্রহসমূহের ভিতর মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির গতিবিবরণ সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি ইকুয়্যান্ট বিন্দু সহ একটি জটিল প্রণালী গঠন করেন। এসব গ্রহগুলার জন্য (Superior Planet) ধারণা করা হয়েছিল যে, সূর্যের গতি পৃথিবীর সাপেক্ষে এবং বহির্গ্রহের গতি তার Epicycle-এ একই হবে অর্থাৎ তাদের ঘূর্ণন এক বছরেই হবে, এভাবে বহির্গ্রহরা সবসময় নিজস্ব Epicycle এর কেন্দ্র থেকে গ্রহ সংযোগকারী রেখা এবং পৃথিবী-সূর্য সংযোগকারী রেখা সবসময় সমান্তরালে থাকে। কিন্তু এরকম আবার বুধ এবং শুক্রগ্রহের ক্ষেত্রে হয়নি। টলেমি দেখতে পান যে অন্য দুটি গ্রহ বুধ এবং শুক্রের গতিবিবরণ পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হলে তাদের Epicycle-কে সবসময়ই সূর্যের সঙ্গে সমরৈখিক অবস্থানে রাখতে হবে। এই মডেলে Deferent বরাবর ঘূর্ণন হবে গ্রহের আবর্তনকাল। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা আবারো এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যদিও টলেমির সংগঠিত ধারণায় পরবর্তীতে গুরুতর ত্রুটি প্রকাশিত হয়, তবুও মহাবিশ্বের গঠন পর্যালোচনা শুরু করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মহাবিশ্বের গঠনের পরবর্তী যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে কোপার্নিকাসের হাত ধরে, যিনি বিশ্ব এবং ঈশ্বর বিষয়ক নিজস্ব জ্ঞান এবং অনুমান থেকে তাঁর গঠন বর্ণনা তৈরি করেছিলেন। এভাবেই ১৫৪৩ সালে নিকোলাস কোপার্নিকাস ও টলেমির ভাবনায় ভুল ধরলেন। বড় রকমের ভুল! তিনিও

Almagest বইটি পড়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। কোপার্নিকাস বললেন, মাঝখানে পৃথিবী থাকে না থাকে সূর্য। চাঁদ আর সব গ্রহদের মত সূর্যের চারদিকে ঘুরে না। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদ তাই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। সব গ্রহেরই উপগ্রহ রয়েছে। কারও কম কারও বেশি। কোপার্নিকাসের কাছ থেকে আমরা প্রথম 'সূর্য-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব – Heliocentric Universe' ধারণা পেলাম; শুরু হল তথাকথিত কোপারনিকান বিপ্লব। কিন্তু ওই প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কেউই উপযুক্ত তথ্য ও গণনার সাহায্যে তাঁদের ধারণা বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সেই কাজটাই প্রথম করে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস। তাই তাঁকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

কোপার্নিকাসের কথা একটু বলা দরকার। কোপার্নিকাস ইউরোপের দেশ পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী ছিলেন। লেখাপড়াটা তাঁর বেশ মজার ছিল। প্রথমে আইন পাশ করেছেন। তারপর ডাক্তারি পাশ করেছেন। তারপর গির্জায় যোগ দিয়েছেন। যত যাই পড়ুন, জ্যোতির্বিদ্যার ভাবনা থেকে কখনও তিনি দূরে থাকেননি, সৌখিন জ্যোতির্বিদ কিছুটা। কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, টলেমির ভাবনা মিলছে না। কোপার্নিকাস অবশ্য গোড়ায় তাঁর গবেষণা ও তত্ত্ব প্রকাশে তেমন উৎসাহ দেখাননি। হয়তো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ চটে যাবেন এই আশঙ্কাতেই। তবে ১৫৩০ সালে 'কমেন্টারিওলাস' নামে একটি প্রবন্ধে প্রথম তার সিদ্ধান্তের কথা লেখেন এবং সেটির পাণ্ডুলিপি ঘনিষ্ঠ মহলে প্রচার করেন। পাশাপাশি চলে এক মহাগ্রন্থ রচনার কাজ। ল্যাটিন ভাষায় একটা ঐতিহাসিক বই লিখলেন কোপার্নিকাস, সেই বইয়ের শিরোনাম — 'De revolutionibus orbium coelestium' (দি রেভলুশনস অব হেভেনলি বডিজ), যার অর্থ *জ্যোতিষ্কদের ঘূর্ণন*। জার্মানির নুরেমবার্গ থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে। সেও রেটিকাস নামে তার এক ছাত্রের চেষ্টায়। গণিতের অধ্যাপক ওই জার্মান তরুণটি কোপার্নিকাসের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর ইচ্ছায় এসে শেষ পর্যন্ত তার কাছে থেকে যান টানা দু-বছর। কোপার্নিকাসের বইয়ের নাম 'রেভলুশনস' ছিল বলেই হয়ত 'রেভলুশন' মানে আজ হয়ে গেছে বিপ্লব, কোপার্নিকাসের 'রেভলুশনস' পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় হিপারকাস, টলেমি, কোপার্নিকাস সবার কাজেই জ্যামিতির সাহায্যে মহাবিশ্বকে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে দেখা যায়।

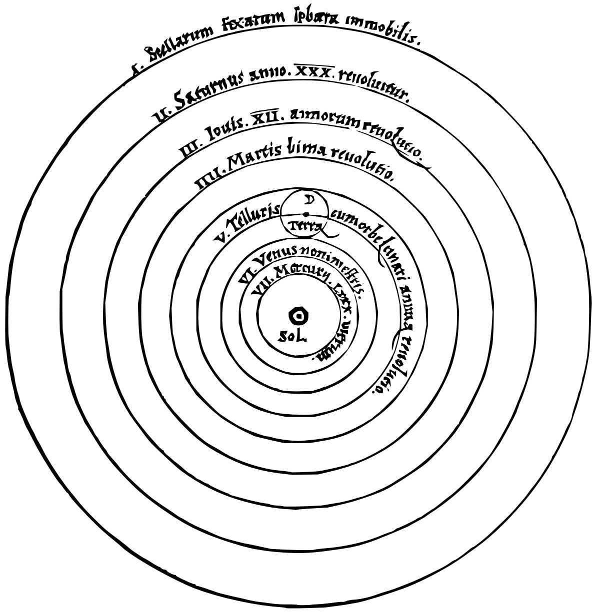

চিত্র ১.২: কোপার্নিকাসের বইয়ে অঙ্কিত সৌরজগতের মডেল

ভারতীয় উপমহাদেশও জ্যোতির্বিজ্ঞানে কম এগিয়ে ছিল না কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকের মধ্য দিয়ে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের ভারত অভিযানের পর খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে।

অধ্যায় ২

বিকিরণ সূত্রাবলী – Radiation Laws

"The universe just talks to us in so many ways, and every time you find a new way of listening, you find something else."

— **Ellen Zweibel, professor of Astronomy**

আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটার চারপাশে যে বিশাল মহাবিশ্ব, এই যে কোটি কোটি তারা নক্ষত্র ছায়াপথ, এই সবকিছু থেকে কেবলমাত্র একটা জিনিসই আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌছাতে পারে – আলো। এই মহাবিশ্ব নিয়ে আমাদের যত জ্ঞান, প্রায় সবকিছুই এসেছে এই আলোর মাধ্যমে। তাই তারার আলো থেকে আমরা কিভাবে সেই তারা সম্পর্কে জানতে পারি, সেইটা বোঝার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে আলো প্রকৃতিতে কিভাবে কাজ করে।

শুরুতেই একটু নজর দেওয়া যাক কিভাবে করে ধীরে ধীরে আলো কিংবা আরো ভালোভাবে বললে তাড়িতচুম্বক বিকিরণ (Electromagnetic radiation) নিয়ে আমাদের ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে।

কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলে যে আলো প্রতিসরিত হয়ে যায় এইটা নিয়ে খৃ.পূ. ২য় শতাব্দীতেই টলেমী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছেন। আল হাসেন ১০৩৮ সালেই দেখিয়েছেন যে বায়ুমন্ডলে আলোর প্রতিসরণের কারণে তারার অবস্থানের পরিবর্তন হয় বা তারা মিটমিটি (twinkle) করে। এর অনেক পরে ১৭ শতাব্দীতে এসে আমরা প্রথম জানতে পারি সাদা আলো যে আসলে অনেকগুলো আলোর সম্মিলিত রূপ। স্যার আইজ্যাক নিউটন দেখান যে সূর্যের আলো একটা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পার করালে, আমরা আলোর একটা বর্ণালী (বা Spectrum) পাই, যেখানে রঙধনুর সবগুলো রঙ দেখতে পাওয়া যায়।

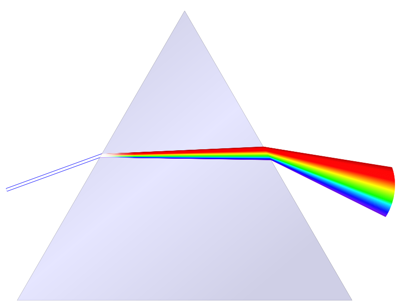

চিত্র ২.১: প্রিজমে আলোর অপবর্তন

১৯ শতাব্দীতে এসে ইয়ং এবং ফ্রেস্নেল তাদের বিখ্যাত ব্যাতিচার (ইন্টারফেরেন্স) পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ ধর্ম প্রমাণিত করেন। এতে বোঝা যায় যে, আলোর বর্ণালীর প্রতিটা বিন্দুতে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য রয়েছে। পরবর্তীতে ১৮০২ সালে ইয়ং নিউটনের পরীক্ষায় পাওয়া বর্ণালী নিয়ে কাজ করেন এবং দেখান যে সূর্যের আলোর এই বর্ণালী[১] ৪২৪ থেকে ৬৭৫ ন্যানোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

[১]আসল সৌর স্পেক্ট্রা – https://bass2000.obspm.fr/solar_spect.php?step=1

চিত্র ২.২: দৃশ্যমান আলোক বর্ণালী

১৮০০ সালে স্যার উইলিয়াম হার্শেল তার পরীক্ষায় সূর্যের বর্ণালীর লাল প্রান্তের কিছুটা বাইরে বিকিরণ নির্ণয় করেন। তার তিন বছর পরে সিলভার ক্লোরাইড নিয়ে কাজ করার সময় রিটার এই বর্ণালীর বেগুণী প্রান্তের কিছুটা বাইরে বিকিরণ আবিষ্কার করেন। সেসময় তারা মনে করেছিলেন যে, দৃশ্যমান বর্ণালীর সীমার বাইরের এই বিকিরণ হয়ত দৃশ্যমান সীমার ভিতরের আলোর থেকে আলাদা। ১৯ শতাব্দীর পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারি যে দৃশ্যমান আলো আসলে তাড়িতচুম্বক তরঙ্গের মধ্যে ছোট্ট একটা অংশমাত্র। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল পরবর্তীতে তাড়িতচুম্বক তরঙ্গ নিয়ে কাজ করে বিখ্যাত চারটি সূত্র প্রদান করেন।

এদিকে ১৮০২ সালে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিসরণ গুণাঙ্ক নির্ণয়ের কাজ করার সময় ইংরেজ রসায়নবিদ উইলিয়াম হাইড উলাস্টন প্রথম সূর্যের বর্ণালীতে কিছু কালো দাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ভেবেছিলেন সেগুলো হয়ত রঙধনুর ৭ টি রঙকে আলাদা করে রাখা কোন প্রাকৃতিক দাগ। পরবর্তীতে ১৮১৭ সালে কাচের প্রতিসরণ গুনাঙ্ক নিয়ে কাজ করার সময় ফ্রনহফার প্রমাণ করেন যে এই কাল দাগ বা অন্ধকার লাইনগুলো সূর্যের বর্ণালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তিনি প্রধান দাগগুলোকে A, B,...K দিয়ে চিহ্নিত করেন।

তারপর ফ্রনহফারই প্রথম আকাশের গ্রহ এবং উজ্জ্বল তারাগুলো থেকে আসা আলোকে প্রিজমের সাহায্যে ভেঙ্গে তাদের বর্ণালী নির্ণয় করেন। তিনি দেখেন যে গ্রহ বা তারা সবার বর্ণালীতেই এই কালো দাগগুলো উপস্থিত আছে কিন্তু গ্রহগুলোর বর্ণালী পুরোপুরি সূর্যের বর্ণালীর মতই যেখানে তারাদের বর্ণালী আলাদা। ফ্রনহফার পরবর্তীতে অপবর্তন গ্রেটিং আবিস্কার করেন যার মাধ্যমে আরো সূক্ষ্মভাবে বর্ণালীর মধ্যে উপস্থিত কালো দাগগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তার এইসব অবদানের জন্য ফ্রনহফারকে Observational Spectrometry (পর্যবেক্ষণলব্ধ বর্ণালীমিতি) এর একজন অগ্রদূত বলা হয়।

২.১ বর্ণালী এবং বর্ণালী রেখা – Spectra and Spectral Lines

আমরা এবার বর্ণালী নিয়ে গভীর আলোচনায় যাই। প্রথমত বোঝা লাগবে বর্ণালী কী বা কেমন হয়, তাই না? আমরা যখন তারার আলোকে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং তীব্রতা (একবর্ণীল আলো) অনুযায়ী ভাগ করি তখনই পাওয়া যায় তার বর্ণালী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ করে গ্রাফের মাধ্যমে একে প্রকাশ করা যায় যাকে বলে Spectrum! আমরা একটি তারার সম্পর্কে অনেক তথ্য পেতে পারি শুধু তারাটির বর্ণালীর আকার দেখে! বর্ণালীর চূড়া কোথায়, তা কী নীলাভ না রক্তিম তরঙ্গের দিকে সরণের প্রবণতা দেখাচ্ছে, বর্ণালীতে দাগ আছে না কি এসব বৈশিষ্ট্য থেকেই অনেক কিছু বের করা যায়। বর্ণালীমিতি হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যার বিকাশ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহের বিষয় হচ্ছে মূলত তিন প্রকারের বর্ণালী–

১. **নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী (Continuous Spectrum):** একটি কৃষ্ণবস্তু কতৃক আদর্শ যে বর্ণালী পাওয়া যায় দেখতে অনেকটা পাহাড়ের চূড়ার মত;

২. **শোষণ বর্ণালী (Absorption Spectrum):** এটিও আসলে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী। কিন্তু দেখা যায়, নির্দিষ্ট

কম্পাকের কিছু আলোর তীব্রতা হঠাত কমে গেছে কারণ সেই আলো গুলো উৎস থেকে পৃথিবী আসার পথে শোষিত হয়ে যায়।

৩. **বিকিরণ বর্ণালী (Emission Spectrum):** বিকিরণ বর্ণালী একটু আলাদা দেখতে। নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মত বর্ণালী না দেখে আমরা নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই শুধু বর্ণালী তীব্রতা দেখব।

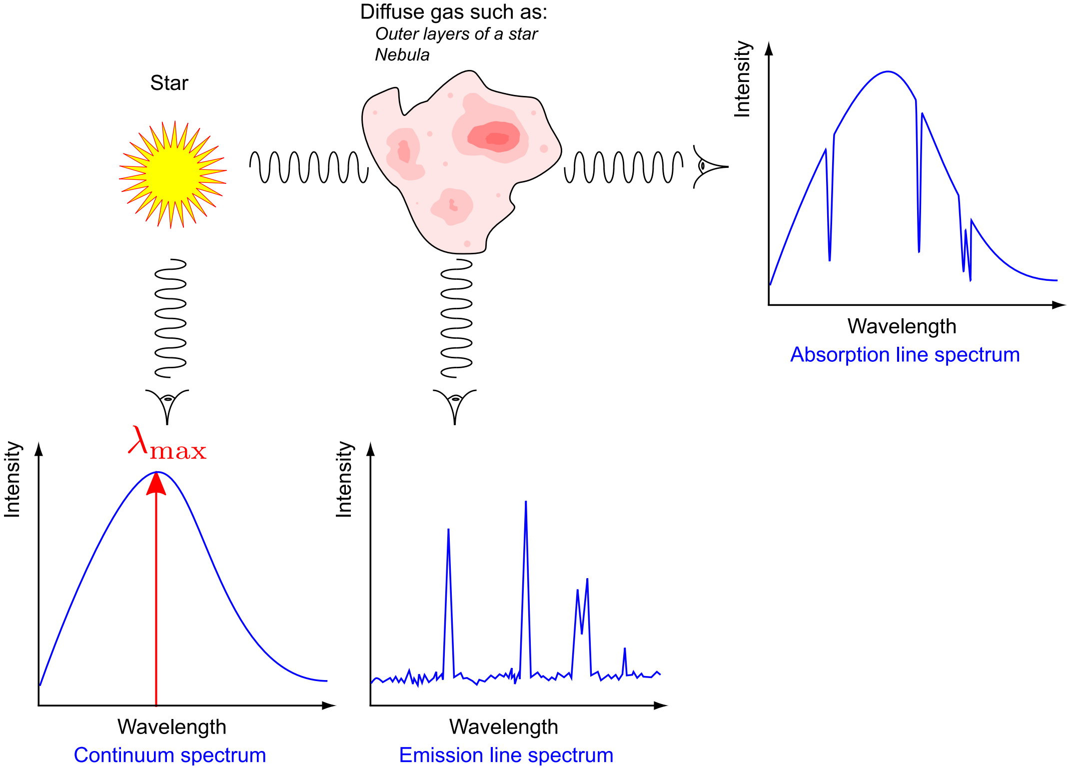

চিত্র ২.৩: বিভিন্ন ধরনের বর্ণালীর আকার

প্রত্যেকটা তারার বর্ণালী তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে; কিন্তু এক্ষেত্রে ২ টি Assumptions আছে। *প্রথমটি* হচ্ছে তারাগুলো কৃষ্ণবস্তু (Blackbody) এবং কৃষ্ণবস্তুর মতই বিকিরণ করে যা তাপীয় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

Blackbody: প্রশ্ন আসতে পারে কৃষ্ণবস্তু (Blackbody) আবার কি জিনিস? কালো বস্তু? কিন্তু তারাগুলো তো আর কালো না? জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমরা Blackbody বলি এমন এক তাত্বিক বস্তুকে, যে তার উপর আপতিত সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ শোষণ করে; একটুও প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত করে না! মোট বিকিরণের জন্য তিনটি সম্ভাবনা– Absorption, a দিয়ে যদি কোনো বস্তুটিতে আপতিত বিকিরণের শোষিত অংশ, Reflection, r দিয়ে প্রতিফলিত অংশ এবং Transmission, t দিয়ে সঞ্চালিত অংশ বোঝায় তাহলে সাধারণ বস্তুর ক্ষেত্রে,

$$a + r + t = 1$$

অর্থাৎ, তার উপর আপতিত সবটুকু বিকিরণ শোষণ করে ফেলে; একটুও প্রতিফলন বা প্রবাহ হতে দেয় না। Blackbody এর ক্ষেত্রে $r = 0$ এবং $t = 0$, সুতরাং $a = 1$। অর্থাৎ Blackbody এর শোষণ গুণাঙ্ক ১ মানে আপতিত বিকিরণের সম্পূর্ণটাই শোষণ করে।

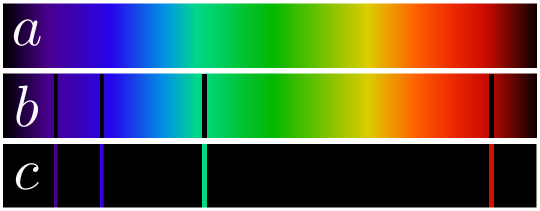

চিত্র ২.৪: a) নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী, b) শোষণ বর্ণালী, c) বিকিরণ বর্ণালী

দ্বিতীয় assumption হচ্ছে তারাগুলোর প্রত্যেকের প্রারম্ভিক গঠন একই, যা প্রায় পুরোটাই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের তৈরি। কেন এটা ধরে নিচ্ছি আমরা? কারণ তারার অভ্যন্তরের প্রক্রিয়া থেকে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী তৈরি হবার কথা কিন্তু এই বর্ণালী যখন তারার পৃষ্ঠে এসে পৌছায় তখন তা শোষিত হয়ে শোষণ বর্ণালী আকারে দেখা যায়। ফলে এই নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালীতে কিছু রেখা যায় যায় যাকে আমরা বর্ণালী রেখা (Spectral lines) বলি। এখন আমরা ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম বর্ণালী সম্পর্কে জানি এবার ২ টি তারার গঠন যদি একই হয় তাহলে তাদের উভয়ের জন্য এই রেখাগুলো একই স্থানে দেখা যাবে। কিন্তু এই রেখা তৈরি হবার কারণ কি হতে পারে?

২.১.১. কার্শফের সূত্র – Kirchhoff's Law

ফ্রনহফার কিন্তু তখন পর্যন্ত সূর্যের বর্ণালীর কালো দাগগুলো কি কারণে বা কিভাবে আসে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এখন আমরা এই ব্যাপারটা একটু অন্যদিক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। আমরা কম বেশি সবাই জানি, কোনো বস্তুর উপর যে কোনো রকম বিকিরণ পড়লে সেটা তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যেতে পারে। কিছু বিকিরণ বস্তুটি শোষণ করে ফেলে, কিছুটা নিজের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয় এবং বাকি অংশটুকু প্রতিফলিত করে। মোট বিকিরণের কতটুকু অংশ শোষিত বা প্রবাহিত বা প্রতিফলিত হবে সেটা থেকে বস্তুটির বিকিরণ সংক্রান্ত আচরণ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। বিকিরণের এই শোষিত বা প্রবাহিত বা প্রতিফলিত হওয়া যেমন বস্তুটি কী দিয়ে তৈরি তার উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনি নির্ভর করে বস্তুটির উপর কী ধরনের বিকিরণ এসে পড়ছে তার উপরও। সুতরাং আলোর তিনটি অবস্থা হতে পারে:

১. **সঞ্চালন (Transmission):** কিছু অংশ ঐ বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত (বা সঞ্চালিত) হয়ে চলে যাবে।
২. **প্রতিফলন (Reflection):** কিছু অংশ ঐ বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ফেরত চলে আসবে।
৩. **শোষণ (Absorbsion):** অবশিষ্ট অংশ ঐ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয়ে যাবে।

আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করা লাগবে এখানে। প্রথমত, কতটুকু শোষণ, প্রতিফলন, সঞ্চালন হবে সেটা আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। যেমন, আমাদের মাংস-চামড়া দৃশ্যমান আলোতে অস্বচ্ছ, তাই সঞ্চালনের পরিমাণ শূন্য। কিন্তু এক্স-রে আপতিত হলে বেশিরভাগ অংশই সঞ্চালিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এই শোষণ, প্রতিফলন, সঞ্চালন নির্ভর করবে যে বস্তুর ওপর আলো আপতিত হচ্ছে, তার তাপমাত্রার ওপর। তৃতীয়ত, কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল বেশি হলে সেই বস্তুর শোষণ, সঞ্চালন, প্রতিফলনের পরিমাণও বেশি হবে।

আমরা এখন আমাদের প্রয়োজনীয় তিনটি রাশি সংজ্ঞায়িত করতে পারি:

- শোষণ গুনাঙ্ক (Absorptivity, a) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আপতিত আলোর (বা আলোকশক্তির) যে পরিমাণ অংশ বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর শোষণ গুনাঙ্ক বলে।
- প্রতিফলন গুনাঙ্ক (Reflectivity, r) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আপতিত আলোর (বা আলোকশক্তির) যে পরিমাণ অংশ বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর প্রতিফলন গুনাঙ্ক বলে।
- সঞ্চালন গুনাঙ্ক (Transmissivity, t) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আপতিত আলোর (বা আলোকশক্তির) যে পরিমাণ অংশ বস্তু কর্তৃক সঞ্চালিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর সঞ্চালন গুনাঙ্ক বলে।

মাঝে মাঝে উপরের তিনটির পরিবর্তে নিচের তিনটি রাশিও ব্যবহার করা হয়–

- শোষণ ক্ষমতা (Absorptive Power, A) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে পরিমাণ আলো (বা আলোকশক্তি) বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর শোষণ ক্ষমতা বলে।
- প্রতিফলন ক্ষমতা (Reflective Power, R) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে পরিমাণ আলো (বা আলোকশক্তি) বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা বলে।
- সঞ্চালন ক্ষমতা (Transmittive Power, T) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফলে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে পরিমাণ আলো (বা আলোকশক্তি) বস্তু কর্তৃক সঞ্চালিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর সঞ্চালন ক্ষমতা বলে।

প্রথম তিনটি হচ্ছে অনুপাত, যাদের মান ০ থেকে ১ এর মধ্যে এবং কোন একক নেই। অন্যদিকে শেষের তিনটির এস আই একক হচ্ছে $\mathrm{Js^{-1}m^{-2}}$।

একইভাবে কোনো বস্তু কিভাবে বিকিরণ করে সেটা নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা 'বিকিরণ ক্ষমতা' অথবা 'বিকিরণ গুণাঙ্ক' ব্যবহার করতে পারি।

১. বিকিরণ ক্ষমতা (Emissive Power, E) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফল থেকে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে পরিমাণ আলো (বা আলোকশক্তি) বস্তু কর্তৃক বিকিরিত হয় তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা বলে।
২. বিকিরণ গুনাঙ্ক (emissivity, ε) – কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বস্তুর একক ক্ষেত্রফল থেকে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরিত আলো (বা আলোকশক্তি) এবং ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকিরিত আলোর (বা আলোকশক্তির) অনুপাতকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঐ বস্তুর বিকিরণ গুনাঙ্ক বলে।

এখন বুঝতেই পারছো যে, বিকিরণ গুনাঙ্ক ব্যবহার করতে হলে আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে ঐ তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ কত বিকিরণ সম্ভব। ১৮৩৩ সালে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্শফ নিচের সূত্রটি প্রদান করেন–

কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যেকোনো বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা এবং তার শোষণ ক্ষমতার অনুপাত ধ্রুব এবং এই অনুপাত বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না।

$$\boxed{\frac{E_\lambda}{A_\lambda} = k\,(\text{constant})}$$

এখানে, A_λ এবং E_λ দ্বারা বোঝায় তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শোষণ ক্ষমতা এবং বিকিরণ ক্ষমতা। $k = B_\lambda(T)$ একটি ধ্রুবক যা শুধু তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।

তার মানে কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যে বস্তু খুব ভাল শোষণ করতে পারে, সে বস্তু খুব ভাল বিকিরণও করতে পারবে। আবার যে বস্তু একদমই কম বিকিরণ করে, সে বস্তু ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শোষণও করবে অনেক কম। কার্শফের সূত্রের এই ধ্রুবকের মান কত সেটা বের করতে গিয়ে বিজ্ঞানী কার্শফ কয়েকটি জিনিসের সংজ্ঞা স্থির করেন। কোনো বস্তুর বেলায়- $a+r+t=1$ যদি কোনো বস্তু তার উপর এসে পড়া সবটুকু বিকিরণ শোষণ করে ফেলে, একটুও প্রতিফলন বা প্রবাহ হতে না দেয় তবে $r=0,\ t=0$ সেক্ষেত্রে, $a=1$। এরকম বস্তুকেই কৃষ্ণবস্তু বা Black Body বলে। কৃষ্ণবস্তুর শোষণ ক্ষমতার মান 1। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতাকে E_b দিয়ে প্রকাশ করলে এবং তার উপর কার্শফের বিকিরণ সূত্র প্রয়োগ করলে আমরা পাব–

$$\frac{E_b}{1} = k \text{ বা } E_b \approx B_\lambda(T)$$

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে কার্শফের সূত্রের ধ্রুবকটির মান আর কিছু নয়- সেটা হল কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা। সুতরাং কার্শফের সূত্রের মূল কথাটা এভাবে বলা হয়–

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের জন্য যেকোনো বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতার অনুপাত একটা ধ্রুবক এবং সেই ধ্রুবকের মান সেই তাপমাত্রায় সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের জন্য একটি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার সমান।

এখান থেকে বলা যায় যেকোনো বস্তুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের জন্য তার বিকিরণ-গুণাংক ও শোষণ-গুণাংকের মান সমান। তাই মহাকাশের যেকোনো নক্ষত্র থেকে আসা আলো দিয়ে বর্ণালী তৈরি করে সেটার সাথে আমাদের পরিচিত পদার্থগুলোর বর্ণালী মিলালে আমরা পৃথিবীতে বসেই বলে দিতে পারি যে সেই নক্ষত্র কী কী উপাদানে তৈরি। শুধু তাই নয়- বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে আমরা কোনো পদার্থ একেবারেই নতুন কিনা সেটাও যাচাই করতে পারি। প্রতিটি পদার্থের বর্ণালীই স্বতন্ত্র, অর্থাৎ কারো সাথে কারো মিলে না। তাই কোনো পদার্থের বর্ণালী যদি একেবারে আনকোরা নতুন হয় তাহলে বলা হয় একটা নতুন পদার্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। এভাবে প্রায় ৪০ টির মত নতুন মৌল খুঁজে পাওয়া গেছে এবং পর্যায়-সারণিতে স্থান দেওয়া হয়েছে! এই ব্যাপারটার গুরুত্ব সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কার্শফ অনুধাবন করেন এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সূর্যের বর্ণালীর সঠিক ব্যাখ্যা দেন যা পরবর্তীতে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান (Astrophysics) ও বর্ণালীমিতির (Spectroscopy) সূচনা ঘটায়।

২.৪ Planetary Temperature and Energy Distribution

গ্রহের বিকিরণ শক্তির উৎস কি?

গ্রহগুলির বিকিরণের উৎস মূলত তিনটি। প্রথমত তাদের অভ্যন্তরের মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা। এই মৌলিক পদার্থগুলি হচ্ছে ইউরেনিয়াম, রুবিডিয়াম, পটাসিয়াম, ইত্যাদি। তাদের নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত আলফা ও বিটা (ইলেকট্রন) কণিকা এবং গামা রশ্মির সঙ্গে বিক্রিয়ায় অভ্যন্তরের পাথর উষ্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে বন্দী শক্তি। একদম প্রথমে, গ্রহের সৃষ্টির সময়, বস্তুকণা সমূহ যখন দানা বাঁধছে, তাদের স্থিতি শক্তি উষ্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই আদি উষ্ণ শক্তি এখনো ধীরে ধীরে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হচ্ছে। ৩য় অবশ্যই সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি, যা গ্রহ/ জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত শক্তির প্রাথমিক উৎস। আমরা এখন এই বিকিরণ থেকে তাদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা বের করা শিখব এতক্ষন যা যা শিখলাম তা ব্যবহার করে! আমরা জানি, নাক্ষত্রিক ক্ষমতা,

$$L = (\text{surface area}) \times \ (\text{flux at surface}) = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

যদি একটা বস্তুর তাপমাত্রা T হয় এবং তার আশেপাশের তাপমাত্রা T_0 হয় তাহলে বস্তুটি তার আসে পাশের সিস্টেম থেকে শক্তি শোষণ করবে, $P_{\text{in}} = 4\pi R^2 \varepsilon \sigma T_0^4$ হারে এবং বিকিরণ করবে, $P_{\text{out}} = 4\pi R^2 \varepsilon \sigma T^4$ হারে। তাহলে শক্তির পরিবর্তনের মোট হার,

$$P_{\text{tot}} = 4\pi R^2 \varepsilon \sigma (T^4 - T_0^4)$$

এভাবে যদি কোনো বস্তু তার আশেপাশের সিস্টেমের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয় তাহলে সে শক্তি বিকিরণ করা শুরু করে। যদি আর কোনো প্রভাব না থাকে বস্তুটির তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। মহাশূন্যের তাপমাত্রা এভাবে $T_0 = 2.725$ K। আমরা এটাও জানি d দূরত্বে একক ক্ষেত্রফলে আপতিত শক্তি তীব্রতাকে ফ্লাক্স বলে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলে আপতিত শক্তি নির্ভর করবে যে বস্তুর ওপরে আলো আপতিত হচ্ছে তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপরে,

$$\text{আলোক শক্তি, } P_{\text{in}} = \text{নির্দিষ্ট দূরত্বে আলোর তীব্রতা, } F_{\text{in}} \times \text{বস্তুর তলের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, } \mathcal{A}$$

Cross Section: আমরা এখন চিন্তা করি যে আমাদের জ্যোতিষ্কের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (cross-sectional area)[১১] কেমন হবে। যদি জ্যোতিষ্কটি (Celestial Object) তুলনামূলক ভাবে দূরে থাকে তখন 'cross sectional area' কে দ্বিমাত্রিক তলের সাথে কল্পনা করা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল ধরব - πR^2। কিন্তু যদি জ্যোতিষ্কটি তুলনামূলক ভাবে কাছে কিংবা অনেক বড় হয়, তখন প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে ত্রিমাত্রিক তল ধরা লাগে, সেক্ষেত্রে একটি অর্ধগোলকের উপরে আলো পড়ছে ধরে কাজ করতে হবে।

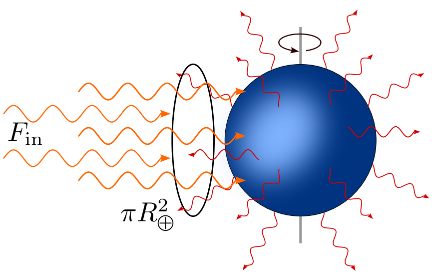

$$P_{\text{in}} = \begin{cases} \left(\dfrac{R_\star}{d}\right)^2 \sigma T_\star^4 \times \pi R_p^2; & \text{পৃথিবী বা যেকোনো ছোট গ্রহের জন্য প্রযোজ্য।} \\ \left(\dfrac{R_\star}{d}\right)^2 \sigma T_\star^4 \times 2\pi R_p^2; & \text{বৃহস্পতির মত বড় গ্রহ বা জোড়াতারা ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য।} \end{cases}$$

[১১]বিভ্রান্তি এড়াতে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে $\mathcal{A}$ এবং আলবিডো কে A দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

Equilibrium Temperature: যদি গ্রহটি/জ্যোতিষ্কটি বিকিরণ সাম্যাবস্থায় (Radiative Equilibrium) থাকে তাহলে অবশ্যই সে যেই পরিমাণ শক্তি শোষণ আকারে গ্রহণ করবে একই পরিমাণ সে বিকিরণ করে দিবে। তাহলে যদি জ্যোতিষ্ক (যার নিজস্ব আলো এবং অভ্যন্তরীণ বিকিরণ উৎস নেই) সে যদি $4\pi R^2\sigma T^4$ সূত্র অনুযায়ী বিকিরণ করে,

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$$
$$\left(\frac{R_\star}{d}\right)^2 \sigma T_\star^4 \times \pi R_p^2 = 4\pi R_p^2 \sigma T_p^4$$
$$T_{\text{eq}} = T_\star \sqrt{\frac{R_\star}{2d}}$$

উদাহরণ ২.8.১: Derive a formula for the fractional change, $\Delta T/T$ in surface brightness–considered uniform of a starlit planet, which would be produced by a small fractional change $\Delta P/P$ in power it receives. [A]

Solution: এক্ষেত্রে গ্রহ কতৃক বিকিরিত এবং শোষিত ক্ষমতা সমান হওয়ায়, $P = P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$।

$$P = P_{\text{emit}} = 4\pi R^2 \sigma\varepsilon T^4$$
$$T = (4\pi R^2\sigma\varepsilon)^{1/4} P^{1/4}$$
$$\frac{dT}{dP} = \frac{1}{4}(4\pi R^2\sigma\varepsilon)^{1/4} P^{-3/4}$$
$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{4}\frac{\Delta P}{P} \quad \checkmark \tag{২.8.১}$$

সমী. ২.8.১ এর ক্ষেত্রে মনে রাখা লাগবে যে, ΔP এর কোন মানের পরিবর্তন হচ্ছে এবং কোনটা ধ্রুবক।

***Q* ২.8.১**

১১ বছরের সৌর কলঙ্কের চক্রের একপর্যায় যদি সূর্যের দীপ্তি 0.1% কমে গেলে তাপমাত্রার পরিবর্তন কত হবে?

আমরা উদাহরণ হিসেবে আমাদের চেনা একটা সূত্র নিয়ে প্রতিপাদনটা করতে পারি,

$$L = 4\pi R^2\sigma T^4$$
$$\log_e L = \log_e(4\pi\sigma) + 2\log_e R + 4\log_e T \quad \text{[উভয় পাশে লগ নিয়ে]}$$
$$\frac{d\log_e L}{dL} = \frac{d\log_e(4\pi\sigma)}{dL} + \frac{d(2\log_e R)}{dL} + \frac{d(4\log_e T)}{dL} \quad [dL \text{ সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করে}]$$
$$\frac{1}{L} = 0 + \frac{2\ d\log_e R}{dL} + \frac{4\ d\log_e T}{dL} \quad \text{[ধ্রুবক সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ শূন্য]}$$
$$\frac{1}{L} = \frac{2d\log_e R}{dR}\frac{dR}{dL} + \frac{4d\log_e T}{dT}\frac{dT}{dL} \quad \text{[চেইন নিয়ম ব্যবহার করে]}$$
$$\frac{1}{L} = \frac{2}{R}\frac{dR}{dL} + \frac{4}{T}\frac{dT}{dL} \implies \frac{dL}{L} = \frac{2\,dR}{R} + \frac{4\,dT}{T}$$

এখন আমরা অতিক্ষুদ্র (infinitesimals) পরিবর্তন না ধরে যদি সামান্য পার্থক্য (Δ) ধরি,

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{2\Delta R}{R} + \frac{4\Delta T}{T}$$

আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করলাম তাকে লগারিদমিক ডেরিভেটিভ বলে। $\Delta L \ll L$ বিষমতারা এবং Exoplanet এর জন্য আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে অংক করে ফেলতে পারব।

Math Ideas: Logarithmic Derivative

যেকোনো সূত্র দেওয়া থাকলে একটি রাশি সাপেক্ষে আরেকটি রাশির পরিবর্তনের জন্য আমরা সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে আস্তে পারি। এখানে যে সাধারণ ক্যালকুলাসের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে,

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

এর আগের উদাহরণে আমরা P এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করায় বাকি রাশিগুলো ধ্রুবক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও সহজে কাজটা করা যেতে আরেকটি সূত্র ব্যবহার করে,

$$\frac{d\log_e x}{dx} = \frac{1}{x}$$

এভাবে যেকোনো সমীকরণের জন্য[a],

$$\frac{\Delta f}{f} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\Delta x_i}{f} \tag{২.৪.২}$$

[a]**See more:** IOAA-14— **D03.B**

২.৪.১. Radiation from Solar System Bodies

কিছু সংশোধন: তারাগুলোকে আদর্শ কৃষ্ণবস্তু ধরে সব কাজ করা যায় কিন্তু তারাগুলো ছাড়া বাকি জ্যোতিষ্ক গুলোর ক্ষেত্রে (গ্রহ/ধুমকেতু/ধূলিকণা) বিকিরণ সূত্রে কিছু সংশোধন করা হয়। এক্ষেত্রে বিকিরণ এবং শোষণ উভয় ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত রাশি থাকে যেমন–

Emissivity: সংজ্ঞায়িত করা হয়, কোনো বস্তুর একক ক্ষেত্রফল থেকে একক সময়ে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যতটুকু বিকিরণ শক্তি বের হয়ে আসে এবং সর্বোচ্চ যতটুকু বের হওয়া সম্ভব তার অনুপাত। একে বিকিরণ-গুনাংক বা বিকিরণ সহগ নামেও ডাকা হয় এবং ε_λ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কার্শফের সূত্র থেকে আমরা জানি, কৃষ্ণবস্তুর বেলায় বিকিরণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ হয়। তাহলে emissivity,

$$\varepsilon = \frac{F_{\text{object(T)}}}{F_{\text{Blackbody}(\lambda,\text{T})}} = \frac{\text{Energy Emitted by an Object at } \boldsymbol{T}}{\text{Energy emitted by a Blackbody at } \boldsymbol{T}}.$$

যা তারাগুলোর জন্য ১ ধরা যায়, যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে তারাগুলো আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর মত কাজ করে।

সাধারণত ফ্লাক্স তীব্রতা (Flux Intensity) এবং মোট ফ্লাক্স (Total Bolometric Flux) কে লেখা হয়

$$B_\lambda = \varepsilon_\lambda \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \quad \text{এবং,} \quad \overline{f} = \varepsilon \sigma T^4$$

Albedo: একটি বস্তু কতখানি আলো শোষণ, বিকিরণ, এবং প্রতিফলন করবে সেটা নির্ভর করে আপতিত আলো যে তলে পড়ে সেটার উপরে। সেক্ষেত্রে আমাদের ঐ জ্যোতিষ্কের (Asteroid, Planets, Satellites) Albedo, $A_\square$ বা প্রতিফলনযোগ্যতা মেপে দেখতে হয় যা আমাদের তাপমাত্রা বের করতে প্রয়োজন হয়। একটি জ্যোতিষ্কের Albedo শূন্য থেকে ১ পর্যন্ত হতে পারে।

i. Albedo সাধারণত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রতিফলিত/বিচ্ছুরিত এবং আপতিত আলোর অনুপাত কে বলে Monochromatic Albedo যাকে A_λ বা A_ν দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ii. আপতিত ফ্লাক্স এবং সূর্যের দিকেই প্রতিফলিত ফ্লাক্সের অনুপাতকে Geometric Albedo, A_g বলে। এটা সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তুর জন্য ব্যবহার করা হয়।

$$A_g = \frac{F(\Psi = 0)}{S_\odot},$$

iii. Bond Albedo, A_b হচ্ছে আপতিত ফ্লাক্স এবং সবদিকে প্রতিফলিত (reflected) এবং বিচ্ছুতির (scattered) ফ্লাক্সের অনুপাত। আমাদের Albedo নিয়ে যত ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হয় প্রায় সবগুলোতে আমরা Bond Albedo ধরে নিয়ে কাজ করি।

$$A_b = \int A_\nu \, d\nu = \left[2 \int_0^\pi \frac{F(\Psi)}{F(\Psi = 0)} \sin \Psi \, d\Psi \right] \times A_g.$$

আলবিডোর মান শূন্য মানে কোনো আলো প্রতিফলিত হয়নি সব শোষণ হয়েছে, ১ মানে পুরোটাই প্রতিফলিত হয়েছে। নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বস্তুর প্রতিফলনযোগ্যতা বা Reflectivity হল Albedo। পৃথিবীর Albedo, $A_\oplus = 0.31$ মানে সূর্য থেকে আসা মোট আলোর ৩১% পৃথিবী প্রতিফলিত করে দেয়! চাঁদের Albedo এর জন্য আবার আমরা চাঁদের আলো দেখতে পাই যা ১৪%! প্রাকৃতিক ভাবে বরফের Albedo সবচেয়ে বেশি! এখন আমরা দেখি যে আমাদের গ্রহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের সূত্রে Albedo কে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, মনে রাখা উচিত যে এইবার A পরিমাণ শক্তি গ্রহটি প্রতিফলন করে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে $(1-A)$ পরিমাণ শক্তি বাকি থাকছে,

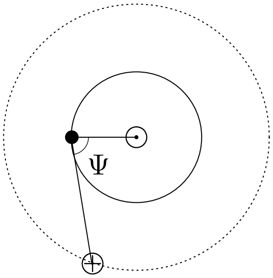

$$P_{\text{in}} = (1 - A) \left(\frac{R_\star}{d} \right)^2 \sigma T_\star^4 \times \pi R_p^2$$
$$P_{\text{out}} = 4\pi\varepsilon R_p^2 \sigma T_p^4$$

বিকিরণ সাম্যাবস্থায়,

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$$

$$(1-A)\left(\frac{R_\star}{d}\right)^2 \sigma T_\star^4 \times \pi R_p^2 = 4\pi\varepsilon R_p^2 \sigma T_p^4$$

$$T_{\text{equlibrium}} = \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\right)^{1/4} \cdot T_\star \sqrt{\frac{R_\star}{2d}} = \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\,\frac{L_\star}{16\pi\sigma d^2}\right)^{1/4}$$

সহজে লিখলে,

$$\boxed{T_{\text{eq}} = \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\right)^{1/4} T_{\text{blackbody}}} \tag{২.৪.৩}$$

সৌরজগতের কিছু জ্যোতিষ্কের জন্য,

– শুক্র গ্রহ, $A_{♀} = 0.7, \varepsilon \approx 1, \quad \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\right)^{1/4} = 0.74,$

– পৃথিবী, $A_\oplus = 0.37,\ \varepsilon \approx 1, \quad \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\right)^{1/4} = 0.89,$

আবার এটা সংজ্ঞায়িত করে নেওয়া যায়,

$$A = 0 \implies \boxed{T_0 = \left[\frac{L_\odot}{16\pi\sigma a_\oplus^2}\right]^{1/4} = 279.5\text{ K}}$$

– মঙ্গল গ্রহ, $A_{♂} = 0.25,\ \varepsilon \approx 1, \quad \left(\frac{1-A}{\varepsilon}\right)^{1/4} = 0.93.$

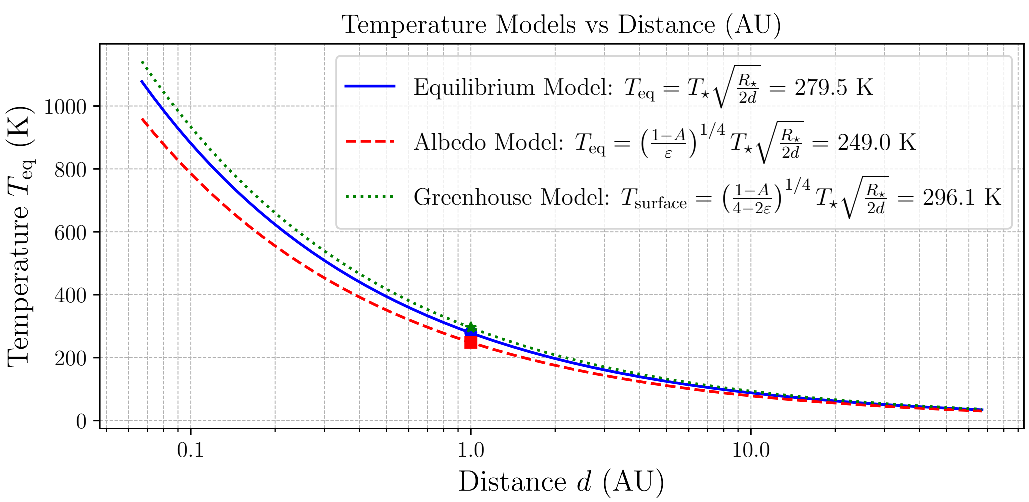

চিত্র ২.১৪: পৃথিবীর জন্য বিভিন্ন মডেলে তাপমাত্রা

অধ্যায় ৩

নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতা পরিমাপ – Stellar Photometry

> *"Remember to look up at the stars and now down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist"*
>
> — **Professor Stephen Hawking**

যখন আমরা আকাশের দিকে দেখি প্রত্যেকটি তারা ছোট ছোট আলোক বিন্দুর মত লাগে। কোটি কোটি আলোক আলোকবর্ষ দূরের তারাগুলো থেকে যে প্রাথমিক তথ্য আমরা পায় তা হচ্ছে তারাটির আপাত উজ্জ্বলতা– বা তারাটি থেকে আমাদের কাছে কি পরিমাণ আলো আসছে (আসলে তাড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ)। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারার উজ্জ্বলতা মাপার এই পদ্ধতিকেই বলে ফটোমেট্রি (Photometry) বা আলোকমিতি। Photometry শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ "photo" যার অর্থ আলো এবং আরেকটি শব্দ "metron" যার অর্থ পরিমাপ– তাহলে এটি তারা থেকে আগত আলোর পরিমাপের বিজ্ঞান বলা যায়।

কোন বস্তু বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যে আলো বিকিরণ করে, তা বিশ্লেষণ করে সেই বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় যেমন আকার, ভর, তাপমাত্রা এবং বস্তুর গঠন সম্পর্কেও দৃঢ় ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও বুঝা যায় কি ধরনের কার্যকলাপ ঘটছে সেই আলোর উৎপত্তিস্থলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই কাজ করার জন্য আরো পদ্ধতি আছে যেমন– জ্যোতির্মিতি (Astrometry), বর্ণালীমিতি (Spectrometry) এবং Polarimetry। এর মধ্যে Spectrometry এর সাথে Photometry এর সম্পর্ক বেশ সুদৃঢ়। তুমি যদি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে চাও যে বিষয়টি তোমার সবার আগে জানা লাগবে তাহল তারার আলো থেকে কি কি তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

বুঝতেই পারছো তারার আলোর সেই ফোটন কণা নিয়ে আমাদের কাজ। Photometry করতে নির্দিষ্ট ফিল্টার মধ্যে দিয়ে এই ফোটন কণা সংগ্রহ করে তার তীব্রতা এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য মেপে দেখা হয় টেলিস্কোপ বা আলোক সংবেদনশীল যন্ত্র (Photo Sensitive Instrument) যেমন সিসিডি ক্যামেরার সাহায্যে। আমাদের চোখ-ও আসলে এক ধরনের Photometer। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিমাপের নির্ভুলতার জন্য আদর্শ পরিমাপক ফিল্টার এবং স্কেল ঠিক করে নিয়েছেন যার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

৩.১ উজ্জ্বলতার মাত্রার স্কেল – Magnitude Scale

তারকা-গুলো কতটা উজ্জ্বল? আকাশের সব তারার উজ্জ্বলতার মান এক নয়, কোন কোন তারা খুবই উজ্জ্বল, কোন কোন তারা অনুজ্জ্বল। সব মিলিয়ে অনুজ্জ্বল তারাদের সংখ্যা অনেক বেশি, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। খালি চোখে খুব অন্ধকার জায়গা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ মিলিয়ে হয়তো খুব বেশি হলে ৫০০০ এর মত তারা দেখা যেতে পারে।

হিপারকাস গ্রিক (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১২০) জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য, কারণ তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিখুঁত পূর্বাভাসের ধারণাটি এনেছেন। তিনি টলেমি-পূর্বযুগের সবচেয়ে সৃজনশীল জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি তারাগুলোর অবস্থান এবং উজ্জ্বলতাও নথিভুক্ত করেছিলেন, যেন পরবর্তী প্রজন্ম তারার জন্ম, ধ্বংস, অবস্থান ও উজ্জ্বলতা পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে। অনেক প্রাচীনকাল থেকে এরকম জ্যোতির্বিদরা তারাদের উজ্জ্বলতা নির্ধারণের জন্য ঠিক করলেন যেসব তারাদের সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে উজ্জ্বল ভাবে দেখা যায় সেগুলো ১ম মাত্রার তারা। এভাবে ২য় মাত্রা, ৩য় মাত্রা করে পর্যায়ক্রমে যেসব তারাগুলোকে খালি চোখে দেখা প্রায় দুষ্কর সেসব তারাদের প্রাচীন পর্যবেক্ষকরা বললেন ৬ষ্ঠ মাত্রা তারা। বলা হয়ে থাকে গ্রিক জ্যোতির্বিদ হিপারকাস প্রায় ২ হাজার বছর আগে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

এ পদ্ধতি অনুযায়ী আসলে একটি তারা অপর তারা থেকে কতটা উজ্জ্বল তা হিপারকাসের আমলের জ্যোতির্বিদেরা ধারণা করেছিলেন মোটামুটি ২.৫ গুণ। মানে ধরো, একটি ১ম মাত্রার তারা ৩য় মাত্রার তারা থেকে ৬.৩ গুণ বেশি উজ্জ্বল! কীভাবে? মানের পার্থক্য $= 2$, $2.5^2 = 6.3$। খালি চোখে আমরা ৬ মাত্রার তারা পর্যন্ত দেখতে পায়! পার্থক্য কত? —৫। উনিশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Norman Robert Pogson[১] ঠিক করলেন যে ১ মাত্রার তারার চেয়ে ৬ মাত্রার তারা ১০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল হওয়া উচিত! তাই তিনিও দৃশ্যমান পর্যবেক্ষণ (চোখ দিয়ে) এর জন্য n ও $n+1$ মাত্রার জন্য উজ্জলতার পরিবর্তন ঠিক করলেন $\sqrt[5]{100} = 2.512$। আশ্চর্য হতে হয় সেই কালের মানুষের পর্যবেক্ষণ দেখে! আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়েও দেখা গেছে একটি তারার উজ্জ্বলতা প্রায় ২.৫ গুণ করেই বৃদ্ধি পায়।

এখন ২ টি তারার উজ্জ্বলতার সাথে ঔজ্জ্বল্য (Magnitude) মানের সম্পর্ক দাঁড়াল –

$$\boxed{\frac{B_1}{B_2} = 2.512^{(m_2 - m_1)}}$$

উভয় পাশে লগ[২] নিয়ে,

$$\begin{aligned}\log\frac{B_1}{B_2} &= -(m_1 - m_2)\log(2.512)\\ \log\frac{B_1}{B_2} &= -0.4(m_1 - m_2)\\ m_1 - m_2 &= -2.5\log\left(\frac{B_1}{B_2}\right) \qquad (৩.১.১)\end{aligned}$$

সমী. ৩.১.১ এটাই সেই বিখ্যাত পগনসের সূত্র! এখন যত ধরনের Magnitude-এর সমস্যার তুমি পাবে তার মূল সূত্র হচ্ছে এইটা। এখানে $m_1 =$ প্রথম তারার ঔজ্জ্বল্য মান, $m_2 =$ দ্বিতীয় তারার ঔজ্জ্বল্য মান। $B_1 =$ প্রথম তারার উজ্জ্বলতা, $B_2 =$ দ্বিতীয় তারার উজ্জ্বলতা! এই সূত্র অনুযায়ী মাত্রা যত ঋণাত্মকের দিকে যাবে উজ্জ্বলতা তত বেশি হবে। এখন তুমি বলে দিতে পারবে চাঁদের চেয়ে সূর্য বা একটি তারা থেকে আরেকটি তারা কত গুণ উজ্জ্বল!

***Q* ৩.১.১**

তুমি আকাশে তারা দেখতে গেছ কিভাবে বুঝবে কোন তারার Magnitude কত?

---

[১] N. Pogson 1856, MNRAS 17, 12

[২] আমরা এখন থেকে $\log_{10} = \log$ ধরে কাজ করব।

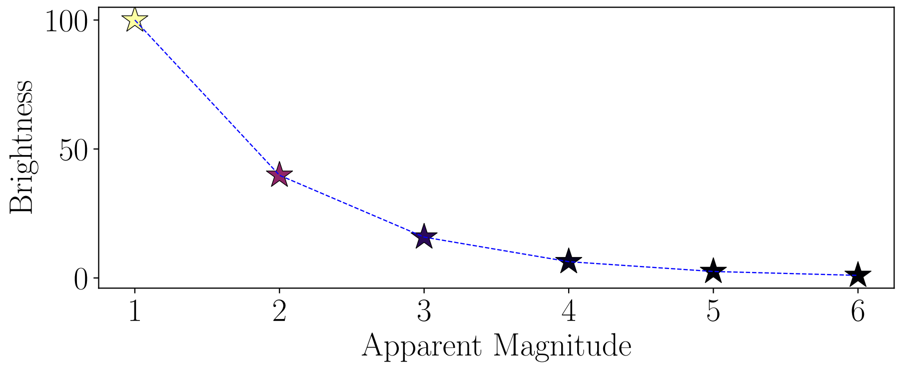

দৃশ্যমান মাত্রা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে কিছু কিছু তারা বা গ্রহের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা জানতে হবে। হিপারকাসের সময় সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সর্বনিম্ন মান ০ ধরলেও বর্তমানের নতুন স্কেলে উজ্জ্বলতার মান ঋণাত্মক হতে পারে। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক - Sirius এর মান হচ্ছে -১.৪৬। খ-গোলের চারটি বস্তুর মান লুব্ধকের চাইতে বেশি– সূর্য, চাঁদ, শুক্র ও বৃহস্পতি। শুক্রর মাত্রা -৪ পর্যন্ত হতে পারে আর বৃহস্পতির মাত্রা -২.৫ এর নিচে হতে পারে। সূর্যের আপাত উজ্জ্বলতার মাত্রা হচ্ছে $M_\odot = -26.8^m$ যা আকাশে সবচেয়ে বেশি!

মনে রাখতে হবে গ্রহদের উজ্জ্বলতার মান সূর্যের ও পৃথিবীর তুলনায় তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। খালি চোখে ০.৫ মানের পার্থক্য ধরা যায়, আর কোনো কোনো অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক এক পঞ্চমাংশ (১/৫ বা ০.২) মানের তফাৎ করতে পারেন। আরেকটি উপায়, তুমি অভিজিৎ - Vega (α Lyrae) কে খুঁজে বের কর। কারণ হল এর আপাত ঔজ্জ্বল্য মান শূন্য ($M_{\text{vega}} = 0^m$) ধরা হয়! এখন খালি চোখে তুমি অভিজিৎ এর সাথে অন্য তারার পার্থক্য করা শুরু কর। অলিম্পিয়াডে যখন প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষাগুলো হয় তোমার এই স্কিল তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত তারাগুলোর Apparent/Absolute Magnitude মনে রাখা ভাল এবং কোনটার জন্য কোন মান ব্যবহার করা হচ্ছে সমাধানের সাথে উল্লেখ করে দেওয়া উচিত।

৩.১.১. পরম ঔজ্জ্বল্য – **Absolute Magnitude**

আচ্ছা এবার তুমি ভেবে দেখ তো, তোমার কাছে আপেক্ষিক ভাবে একটি বাল্ব, পূর্ণিমার চাঁদের মতই আলোকিত লাগছে– তার মানে আসলেই কি ২ টা জিনিস একই পরিমাণ আলো দিচ্ছে?! চাঁদ তো সেই... দূরে, আর লাইট বাল্ব ধরো তোমার ১ হাত দূরে! হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ তাহলে তারার দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারাটি তোমার কাছে কতটা উজ্জ্বল লাগবে তা আমাদের চোখের দেখার বা পর্যবেক্ষণের স্থানের উপর নির্ভরশীল!

তাহলে আমরা তো আসলে আন্দাজ করতে পারছি না একটি তারা নিজে থেকে কতটা উজ্জ্বল! এর তো সমাধান দরকার! এবার এই সমস্যা দূর করতে জ্যোতির্বিদরা ভাবলেন, "আমি সব তারাকে একই দূরত্বে রেখে দেখব!" যা বলা তাই কাজ, তারা ঠিক করলেন ১০ পারসেক দূরে রেখে সব তারা কে পর্যবেক্ষণ করা যাক![৩] ১০ কেন নেওয়া হল? —তার কারণ আমার Magnitude এর সূত্র এবং আমাদের চোখের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও লগারিদমিক ভাবে কাজ করে![8] গণনা করতেও সুবিধা হয় এভাবে! পরে এই নিয়ম খাটিয়ে নতুন পর্যবেক্ষণের সাথে দেখা গেল আপাত ভাবে একটি তারা উজ্জ্বল মনে হলেও অন্য অনুজ্জ্বল তারা প্রকৃত ভাবে বেশি উজ্জ্বল হতে পারে!

---

[৩] Kapteyn 1902; Publ. Gron. 11, 1
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner_law

এভাবে তারাদের একই দূরত্বে রেখে ঔজ্জ্বল্যকে বলা হয় পরম ঔজ্জ্বল্য বা পরম উজ্জ্বলতার মাত্রা (Absolute Magnitude)। পগসনের সূত্র থেকে এর গাণিতিক সূত্র বের করা যায়। যেমন দেখ,

$$M_{\text{Absolute}} - m_{\text{apparent}} = -2.5 \log\left(\frac{F}{f}\right)$$
$$M_{\text{Absolute}} - m_{\text{apparent}} = -2.5 \log\left(\frac{L/4\pi D^2}{L/4\pi d^2}\right)$$
$$M_{\text{Absolute}} - m_{\text{apparent}} = -2.5 \log\left(\frac{d^2}{D^2}\right)$$

ধরি, $d =$ তারাটির আসল দূরত্ব পারসেকে; $D = 10$ pc।

$$M_{\text{Absolute}} - m_{\text{apparent}} = -5 \log\left(\frac{d}{10\,\text{pc}}\right) \tag{৩.১.২a}$$
$$M_{\text{Absolute}} = m_{\text{apparent}} - 5 \log d[\text{pc}] + 5 \tag{৩.১.২b}$$

সমী. ৩.১.২b এখানে আমরা একই তারার ২ টি মানের তুলনা করছি বলেই কাটাকাটি সম্ভব হয়েছে! এই দূরত্ব অবশ্যই আসবে Parsec এককে।

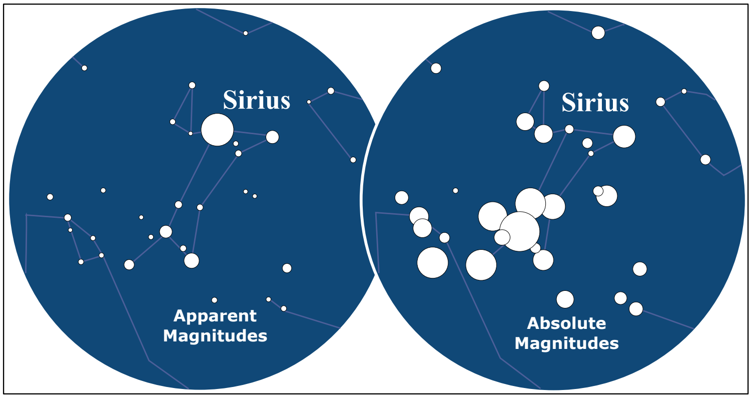

চিত্র ৩.১: Canis Major তারামন্ডলের তারাগুলোকে উজ্জ্বলতা অনুযায়ী ডট দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বামে আপাত ঔজ্জ্বল্যের জন্য প্রত্যেকটি বাস্তবে যেমন লাগে অন্যদিকে ডানে ১০ পারসেক দূরে রাখলে তারাগুলোকে পরম ঔজ্জ্বল্য অনুযায়ী যেমনটা লাগবে।

সৌরজগতের সকল বস্তুর জন্য পরম মাত্রার আরেকটি পরিশোধিত সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পরম মাত্রা H, ধরা হয় পৃথিবী/সূর্য থেকে ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক সমান দূরত্বে কোনো বস্তুর আপাত ঔজ্জ্বল্য যখন Phase Angle শূন্য থাকে। আদর্শ ভাবে এমতাবস্থায় ৩ টি জ্যোতিষ্ক দিয়ে একটি সমবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করা যায়। কৃত্তিম উপগ্রহ (Satellite) এর জন্য এই আদর্শ দূরত্ব ধরা হয় 1000 km তখন পরম মাত্রাকে g হিসেবে লেখা হয়।

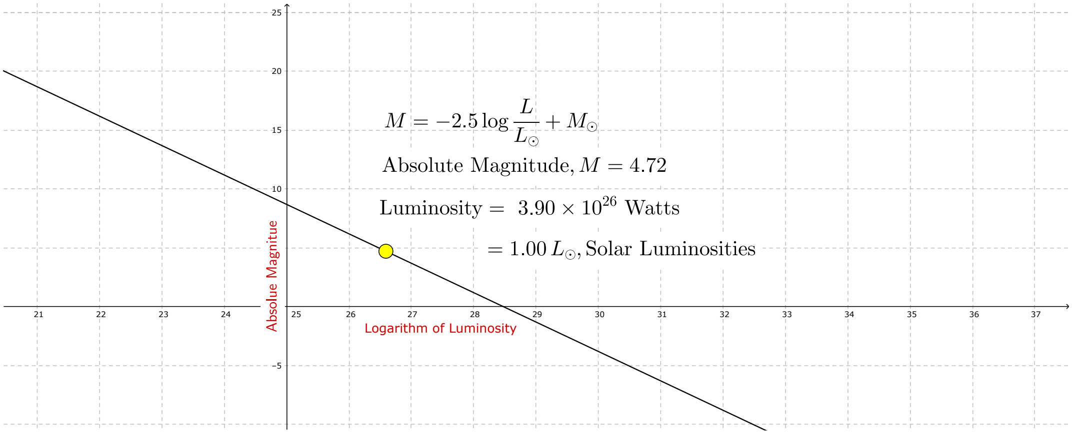

চিত্র ৩.২: পরম ঔজ্জ্বল্য বনাম নাক্ষত্র ক্ষমতা (সৌর এককে)

Simulation

উপরের গ্রাফটি তুমি ইন্টার-এক্টিভ ভাবে ব্যবহার করতে পারো Geogebra তে– https://www.geogebra.org/m/pbanu9fh

Astronomical Convention

Magnitude Notations:

১. Astronomical Magnitude কে সাধারণত সংখ্যার সাথে সূচক আকারে লেখা হয় যেমন 1^m। 1 magnitude in short 1 mag, যেন m দিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য এককের সাথে গোলামাল না হয়ে যায়!

২. বাংলাতে সাধারণত অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন করা হয় না তাও বই লেখার স্বার্থে আমরা Apparent Brightness (B) কে আপাত উজ্জ্বলতা এবং Apparent Magnitude (lower case $\boldsymbol{m}$) কে আপাত ঔজ্জ্বল্য/উজ্জ্বলতার মাত্রা/মান বলব। একই ভাবে Absolute Magnitude (upper case $\boldsymbol{M}$) কে পরম ঔজ্জ্বল্য/উজ্জ্বলতার-মাত্রা বলব।

৩. নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতার এই স্কেল কিন্তু উলটা মানে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে উজ্জ্বলতার মান হ্রাস পাওয়া। তাই অনেক সময় বুঝতে ভুল হয়ে যেতে পারে।

৪. আমরা m_i বা M_i দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যান্ডে আপাত/পরম ঔজ্জ্বল্য বুঝিয়ে থাকি। অনেক সময় নির্দিষ্ট ব্যান্ডের ঔজ্জ্বল্যকে সহজে লিখতে এভাবে লেখা হতে পারে, $m_V = V$ বা $m_B = B$ এবং $m_B - m_V = B - V$।

৩.৬ ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবেশ...

এই অধ্যায়ে আমরা শিখলাম কিভাবে বিভিন্ন আলোকমিতিক ফিল্টার ব্যবহার করে আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা (বা পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা) পরিমাপ করে। আরও দেখলাম যে, উজ্জ্বলতা নিয়ে কাজ করার সময় প্রায় সময়েই একটা আদর্শ উজ্জ্বলতার (বা জিরো বিন্দুর) সাথে তুলনা করার প্রয়োজন হয়।

একটা ব্যবহারিক উদাহরণ হিসেবে, ধরা যাক, আমরা Whirpool (M51) গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করতে চাচ্ছি। প্রথমেই আমাদের টেলিস্কোপ সেইদিক বরাবর ফোকাস করতে হবে। এরপরে আমরা যেই নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দেখতে চাচ্ছি সেই অনুযায়ী আলোকমিতিক ফিল্টার সেট করতে হবে। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ফিল্টারে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের জ্যোতিষ্কর (অথবা একই গ্যালাক্সির ভিন্ন ভিন্ন এলাকার) উজ্জ্বলতার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। ফিল্টার সেট করার পরে, টেলিস্কোপের ফোকাল অঞ্চলে সিসিডি বা কোনো এক ধরনের ফটোমেট্রিক প্লেট বসানো লাগবে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আমাদের টার্গেট বরাবর ফোকাস করে রাখতে হবে। (মনে রাখা লাগবে যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে যেন ফোকাসের বাইরে না চলে যায়, এজন্য একই গতিতে টেলিস্কোপও সরাতে হবে)।

আমরা Johnson-Morgan সিস্টেমের V ফিল্টার দিয়ে Whirpool গ্যালাক্সি ১৩৬ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম, ফোকাল পয়েন্টে ৩০৫০×২১৫০ পিক্সেলের সিসিডি প্লেটের সাহায্যে। যেই পিক্সেলের ফোটন কাউন্ট বেশি, সেই পিক্সেলে আপতিত আলোর পরিমাণও বেশি, তার মানে আপাত উজ্জ্বলতাও বেশি। প্রতিটি পিক্সেলের ফোটন কাউন্টকে কালার কোডেড করলে (ফোটন কাউন্ট সবচেয়ে কম হলে সাদা – যত বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে ধূসর থেকে একদম কালো পর্যন্ত) আমরা নিচের ছবিটা পাব।

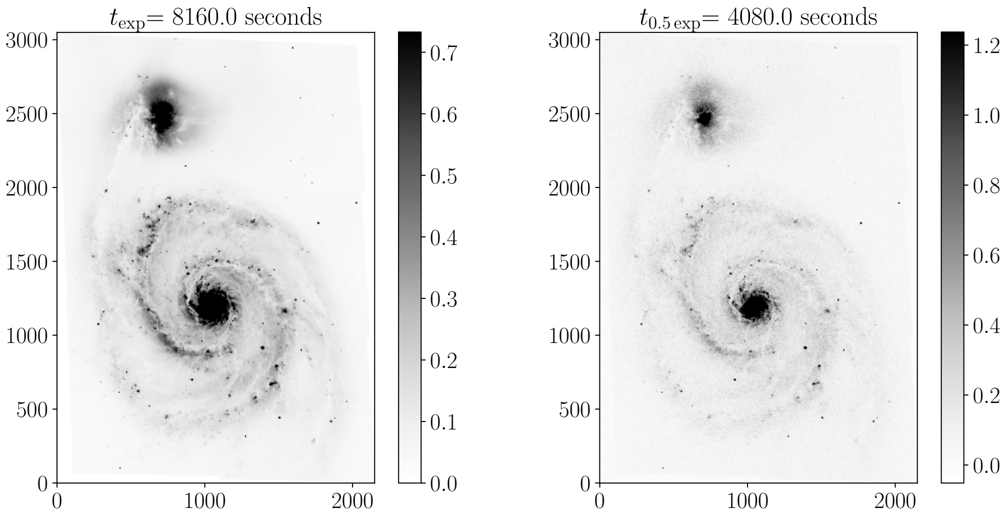

প্রথম দেখাতেই স্পষ্ট যে, গ্যালাক্সির কেন্দ্র, স্পাইরাল ডিস্ক অঞ্চল আর গ্যালাক্সির বাইরে (ব্যাকগ্রাউন্ড) উজ্জ্বলতার পার্থক্য অনেক বেশি। গ্যালাক্সির আসল ফোটন কাউন্ট পাওয়ার জন্য, আগে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ফোটন কাউন্ট বের করে সেটা গ্যালাক্সি ফোটন কাউন্ট থেকে ব্যাড দেওয়া লাগবে। তারপর ফোটন কাউন্ট থেকে উজ্জ্বলতার মাত্রা বের করার জন্য, আমাদের জানা লাগবে এই নির্দিষ্ট ফিল্টারে এবং এই টেলিস্কোপের জন্য সিসিডির জিরো বিন্দু উজ্জ্বলতার মাত্রা কত– যার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ফোটন কাউন্টের মান হবে ১ (এক)। কিভাবে আমরা এই ক্যালিব্রেশন করি? জানা উজ্জ্বলতার কোনো বস্তুকে আগে এই সিসিডি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখি যে ফোটন

কাউন্ট কেমন হচ্ছে, তারপর তুলনা করি দেখি যে কত মাত্রার জন্য ফোটন কাউন্ট আসে ১।

আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, যেহেতু আমরা প্রতিটি পিক্সেলের জন্য উজ্জ্বলতার মাত্রা পাচ্ছি, তাই আমরা আসলে গ্যালাক্সির (বা গ্যালাক্সির বিভিন্ন অঞ্চলের) পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা পাব একবার পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা (বা উজ্জ্বলতা) পাওয়ার পর কিভাবে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হয়, সেটা আমরা এই অধ্যায়ে শিখেছি। আমরা এটাও দেখেছি যে, উজ্জ্বলতার অনিশ্চয়তা কমানের জন্য, ফোটন কাউন্টের অনিশ্চয়তা কমাতে হবে, আর সেজন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ সময় বাড়ানো বা টেলিস্কোপের আলো গ্রহণের এলাকা (অ্যাপারচার) বা সেনসিটিভিটি বাড়ানো।

আগামী অধ্যায়ে এখন আমরা এই টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত দেখব। সাথে দেখব যাত্রাপথে আলো কিভাবে বিভিন্ন বাধার মুখে বিলুপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হয়, তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ফিল্টারের মধ্যে উজ্জ্বলতার কীরকম পার্থক্য দেখা যায়, এবং কিভাবে আমরা এইসব ভিন্নতা ব্যবহার করে তারা বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ককে শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সম্পর্কে অজানা সব তথ্য বের করে আনতে পারি।

অধ্যায় ৪

নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণ – Stellar Observations

"The debt to our ancestors for the observations they made to our benefit, we can pay only by doing the same to the advantage of our successors."

— **Ejnar Hertzsprung**, 1961

কখনো চিন্তা করে দেখেছো আমরা নক্ষত্র সম্পর্কে মূল কি কি বিষয় জানতে পারি? যখন রাতের আকাশের দিকে তাকানো হয় তখন তারাগুলোকে শুধু আলোকিত বিন্দুর মত লাগে— কবির কাব্যিক ভাষায় আকাশের গায়ে ঝিকিমিকি মতি। কিন্তু আমরা যদি ভালমতো লক্ষ্য করি তাহলে বলতে পারব বিশেষ করে কিছু তারা বেশি উজ্জ্বল আবার কিছুর আছে নিজস্ব রঙিন আভা। বর্তমান যুগে এসে আমরা জানি এই তারাগুলো আসলে আমাদের নিজের সূর্যের মত উত্তপ্ত আলোক পিন্ড যাদেরকে বিন্দুর মত লাগে কারণ এগুলো আমাদের থেকে বহু দূরে অবস্থিত।

আমরা তো আমাদের সূর্যকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং দেখেই বলা যায় এটি আসলে গোলাকার একটি বস্তু যা অনেক তাপ ও আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইকেরাস যেমন কল্পনা করেছিল আকাশে গিয়ে সূর্যকে ধরে দেখবে আমরাও চাই মহাকাশের বিভিন্ন অজানাকে জানতে। আমরা এখন জেনেছি সূর্যের পৃষ্ঠে যে পদার্থ আছে তারও বাস্তবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাব হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংখ্যায়িত করা— গণনা করা। কিন্তু মহাজাগতিক এই বস্তু গুলোর বৈশিষ্ট্য যেমন আকার, ভর, বয়স, তাপমাত্রা, দূরত্ব ইত্যাদি যখনই আমরা গণনার মধ্যে আনার চেষ্টা করি তখন আমাদের হিমশিম খেতে হয় কারণ এত বৃহাদাকার সব তথ্য আমাদের কল্পনার বাইরে পৃথিবীতে থেকে আমরা কখনই এইসব ব্যাপারগুলো অনুধাবন করত পারি না। তাইত প্রাচীন পন্ডিতরা ঠিক বুঝে উঠতেই পারতেন না যে আমাদের পৃথিবীর আকারই কত বড় বা তুলনামূলক ভাবে সূর্য কত বড়!

কিন্তু যখন আমরা আমাদের মহাবিশ্বের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া শুরু করলাম তখন আমরা আস্তে আস্তে সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্য আরো সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করা শুরু করলাম। এবার আমরা মহাজাগতিক এই বস্তু— জ্যোতিষ্কগুলোর বিভিন্ন মান নিয়ে আলোচনা করব। নক্ষত্রগুলোর পর্যবেক্ষণীয় তথ্যগুলো মূলত তিন প্রকার–

১. আকাশে তারার অবস্থান (Apparent Positions): কোনো কিছুকে চিনতে হলে কি জানা লাগে?– তার ঠিকানা! তারাদের ক্ষেত্রেও আমরা আকাশের দেয়াল কল্পিত খ-গোলকে একটি তারার অবস্থান কোথায় সেটা বের করার চেষ্টা করি। যখন পৃথিবীর নিজস্ব আহ্নিক গতি এবং সূর্যের চারিপাশে আমাদের বার্ষিক গতির প্রভাব আমরা আলাদা করতে পারি তখন সেই নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে তারাদের কোনো তফাৎ হয়েছে কিনা তা বের করা যায়।

২. আপাত উজ্জ্বলতা (Apprent Brightness): আদিকাল থেকেই মানুষ আকাশ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করে আসছে। তারার উজ্জ্বলতার মাপার এবং লিপিবদ্ধ করার যে পদ্ধতি প্রাচীন গ্রিকরা শুরু করেছিলেন সেই নিয়ম মেনেই আমরা উজ্জ্বলতার পরিমাপের স্কেল তৈরি করেছি। এখন পর্যন্ত হাজার হাজার তারার উজ্জ্বলতার ক্যাটালগ করে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে বিস্তারিত আমরা এর আগের অধ্যায়ে ৩.১ আলোচনা করেছি।

৩. বর্ণালী (Color or Spectrum): বর্ণ বা রং-কে আমরা অনুধাবন করতে পারি আমাদের চোখের ৩ টি সংবেদনশীল রিসেপ্টরের কারণে, যা দৃশ্যমান আলোতে ৩ টি মৌলিক রং (লাল, সবুজ, এবং নীল – RGB) আলাদা করতে পারে। তেমনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারকার আলোকে বিভিন্ন ফিল্টারের সাহায্যে আলাদা বর্ণালীতে ভাগ করা হয় যা থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে পারি বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বর্ণালী রেখাগুলো তারার গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করতে পারে।

মূলত এই ৩ টি পর্যবেক্ষনীয় তথ্য থেকে আমরা তারাদের সম্পর্কে আরো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বের করতে পারি। এই ২য় ধাপের তথ্যগুলো হল—

১. দূরত্ব (Distance)
২. নাক্ষত্রিক ক্ষমতা (Luminosity)
৩. তাপমাত্রা (Temperature)
৪. আকার বা ব্যাসার্ধ (Size/radius)
৫. মৌলিক গঠন (Elemental Composition)
৬. বেগ (Space Velocity)
৭. ভর (Mass)
৮. বয়স (Stellar Age)
৯. ঘূর্ণন (Rotation)
১০. ভর পরিবর্তন (Mass Loss Outflows)
১১. ম্যাগনেটিক ফিল্ড (Magnetic Field)

বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাপ্তির অনুক্রমে সাজানো হয়েছে। আমরা জোতির্বিজ্ঞানে মূলত এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বের করার কৌশল নিয়েই আলোচনা করব।

৪.৬ পর্যবেক্ষণ থেকে তারার জ্ঞান!

আমরা যা যা মাপতে পারি	আমরা যা যা বের করতে চাই
ফটোমেট্রি (Photometry):	দূরত্ব (distances)
আপাত ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, বিষমতা	দীপ্তি (Luminosities)
	তাপমাত্রা (Temperatures)
বর্ণালিমিতি (Spectroscopy):	ধাতবতা (Metallicities)
বর্ণালীয় শ্রেনিবিন্যাস, শোষণ/বিকিরণ রেখার তীব্রতা, অরীয় বেগ v_r	ভর (Masses)
	জীবনকাল (Ages)
নাক্ষত্রিক গতি (Stellar Motion):	মহাকাশে বেগ (Space Velocities)
নাক্ষত্র সরল গতি, লম্বন	

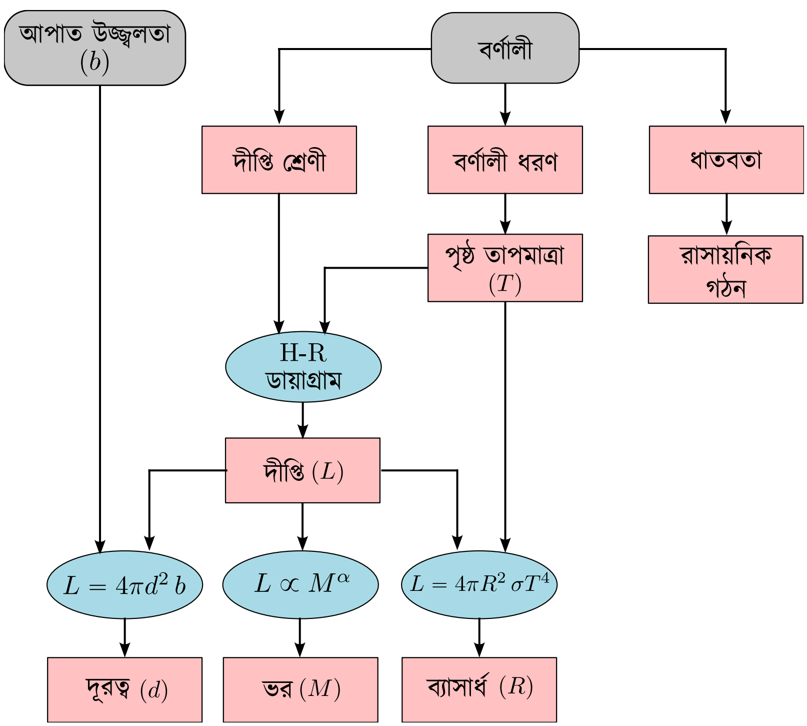

অধ্যায় A

জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে গণিতের হাতিয়ার!

বিজ্ঞানের যেকোনো শাখাতেই গণিত আর গাণিতিক সূত্রের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তেমনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যও আমাদের কিছু গাণিতিক প্রয়োগ এবং কনসেপ্টের ধারণা থাকা আবশ্যক। জ্যোতির্বিজ্ঞান খুব একটা সহজ না হলেও অনেক মজার, যেখানে গণিত এবং ফিজিক্সের অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। তাই বিশেষ কিছু গাণিতিক কনসেপ্টের ব্যবহার আমরা এই বইয়ে তুলে ধরছি যা প্রায়ই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে এবং অলিম্পিয়াডের সমস্যার সমাধানে অনেক প্রয়োগ করা হয়। শুরুতেই আমরা তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিব জ্যোতির্বিজ্ঞানে সমস্যার সমাধান কীভাবে করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে একটু আলাদা কারণ এখানে আমরা ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি না, আমরা পর্যবেক্ষণ করি। মানে আমরা কোনো জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরাসরি পরীক্ষা করে দেখতে পারি না যে ব্যবস্থাটি কীভাবে আচরণ করবে। প্রকৃতি আমাদের উদার হাতে যে তথ্য দেয় তা থেকেই আমাদের বিভিন্ন ফলাফল বের করতে হয়, যেমন আমরা আমাদের জীবনকালে এটাও পর্যবেক্ষণ করতে পারব না যে আমাদের সূর্যের বিবর্তন কীভাবে হবে। তারমানে এখানে আমাদের কার্যপ্রণালী সাধারণের চেয়ে অনেকটা আলাদা হবে।

অধ্যায় B

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধ্রুবক ও একক

সারণী B.১: সার্বজনীন ধ্রুবক

শূন্যস্থানে আলোর দ্রুতি	Speed of light in vacuum	c	$=$	2.998×10^{8} ms^{-1}
প্ল্যাংকের ধ্রুবক	Planck's Constant	h	$=$	6.626×10^{-34} J Hz^{-1}
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	Gravitational Constant	G	$=$	6.67384×10^{-11} Nm^{2} kg^{-2}
বোল্টজমানের ধ্রুবক	Boltzmann's Constant	k_B	$=$	$1.3806488 \times 10^{-23}$ JK^{-1}
স্টিফেন-বোল্টজমানের ধ্রুবক	Stefan-Boltzmann Constant	σ	$=$	5.67×10^{-8} Wm^{-2}K^{-4}
ইলেকট্রিক ধ্রুবক	Electric Constant	ϵ_0	$=$	8.854×10^{-12} m^{-2} kg^{-1}s^{4}A^{2}
কুলম্ব ধ্রুবক	Coulomb Constant	$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$=$	8.98755179×10^{9} Nm^{2} C^{-2}
আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক	Ideal Gas Constant	R	$=$	8.315 Jmol^{-1}K^{-1}
রিডবার্গের ধ্রুবক	Rydberg's Constant	R_∞	$=$	1.0974×10^{7} m^{-1}
ভিনের ধ্রুবক	Wien's Constant	$b = \lambda_{\max} T$	$=$	$2.89776829 \times 10^{-3}$ m K
থমসনের ক্রস-সেকশন	Thompson cross-section	σ_T	$=$	6.652×10^{-29} m^{2}
ইলেকট্রনের চার্জ	Charge of a electron	q_e	$=$	1.602×10^{-19} C
হাবলের ধ্রুবক	Hubble Constant	H_0	$=$	67.80 ± 0.77 km s^{-1}Mpc^{-1}

সারণী B.২: জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রচলিত একক

জ্যোতির্বিদ্যা একক	1 Astronomical Unit (AU)	$a_\oplus$	$=$	1.4960×10^{11} m
১ আলোকবর্ষ	1 lightyear	ly	$=$	9.46×10^{15} m
১ পারসেক	1 parsec	pc	$=$	3.0856×10^{16} m
১ জানস্কি	1 jansky	Jy	$=$	10^{-26} Wm^{-2} Hz^{-1}
অভিকর্ষজ ত্বরণ	Gravitational acceleration	g	$=$	9.81 ms^{-2}
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	Gravitational Constant	G	$\approx$	4.3×10^{-3} pc (km/s)^{2} M$_\odot^{-1}$

সারণী B.৩: সূর্য ⊙

ভর	Mass	$M_\odot$	=	1.9891×10^{30} kg
ব্যাসার্ধ	Radius	$R_\odot$	=	6.955×10^{8} m
দীপ্তি	Luminosity	$L_\odot$	=	3.826×10^{26} W
আপাত ঔজ্জ্বল্য	Apparent Magnitude at Mid-day	$m_\odot$	=	-26.74
পরম V-ব্যান্ড ঔজ্জ্বল্য	Absolute V-band magnitude	$M_{V\odot}$	=	$+4.82$
পরম বোলমিতিক ঔজ্জ্বল্য	Absolute bolometric magnitude	$M_{bol,\odot}$	=	$+4.74$
আপাত কৌণিক ব্যাস	Apparent angular diameter	$\theta_\odot$	=	$32'$
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	Temperature on the surface	$T_{\text{eff},\odot}$	=	5778 K
সৌর একক (পৃথিবীতে)	Solar Constant (at Earth)	$S_\odot$	=	1366 W/m^2
গ্যালাক্টিক কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব	Distance of the Sun from the Galactic centre		≈	8 kpc

সারণী B.৪: চাঁদ ☾

ভর	Mass	$M_☾$	=	7.4377×10^{22} kg
ব্যাসার্ধ	Radius	$R_☾$	=	1.7374×10^{6} m
পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব	Mean distance from Earth	$d_☾$	=	3.78×10^{8} m
নাক্ষত্রিক আবর্তনকাল	Sidereal Period	$T_☾$	=	27.322 days
যুতিকাল	Synodic Period	$P_☾$	=	29.531 days
ড্র্যাকোনিক মাস	Draconic Month	$T_{\text{dra},☾}$	=	27.212 days
আপাত ঔজ্জ্বল্য (পূর্ণিমা)	Apparent Magnitude (Full Moon)	$m_☾$	=	-12.74
আপাত কৌণিক ব্যাস	Apparent angular diameter	$\theta_☾$	=	$31'$
সৌরতল সাপেক্ষে চাঁদের কক্ষতলের নতিকোণ	Inclination of the lunar orbit w.r.t. the ecliptic	i	=	$5°14'$
চাঁদের বিষুবরেখা সাপেক্ষে কক্ষতলের নতিকোণ	Inclination of the lunar equator to its orbital plane		=	$6.687°$
কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা	Orbital eccentricity	ϵ	=	0.0549
আলবিডো	Albedo	$A_{b☾}$	=	0.14
জ্যামিতিক আলবিডো	Geometric Albedo	$A_{g☾}$	=	0.12

সারণী B.৫: সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের তথ্য এবং উপাত্ত

Property	ভর (Mass) m / kg	ব্যাসার্ধ (Radius) R / m	কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (Orbital radius) a / m	আবর্তনকাল (Orbital Period) T	কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা (Orbital eccentricity) ϵ	আলবিডো $A_{□}$
বুধ (Mercury) ☿	3.302×10^{23}	2.439×10^{6}	5.791×10^{10}	87.97 days	0.205	0.088
শুক্র (Venus) ♀	4.868×10^{24}	6.051×10^{6}	1.082×10^{11}	224.70 days	0.0067	0.76
পৃথিবী (Earth) ⊕	5.972×10^{24}	6.370×10^{6}	1.496×10^{11}	365.24 days	0.0167	0.31
মঙ্গল (Mars) ♂	6.419×10^{23}	3.396×10^{6}	2.279×10^{11}	686.97 days	0.0933	0.25
বৃহস্পতি (Jupiter) ♃	1.899×10^{27}	7.149×10^{7}	7.785×10^{11}	11.86 years	0.0488	0.51
শনি (Saturn) ♄	5.685×10^{26}	6.027×10^{7}	1.433×10^{12}	29.46 years	0.0557	0.34
ইউরেনাস (Uranus) ⛢	8.681×10^{25}	2.556×10^{7}	2.877×10^{12}	84.32 years	0.0444	0.30
নেপচুন (Neptune) ♆	1.024×10^{26}	2.476×10^{7}	4.503×10^{12}	164.79 years	0.0112	0.29

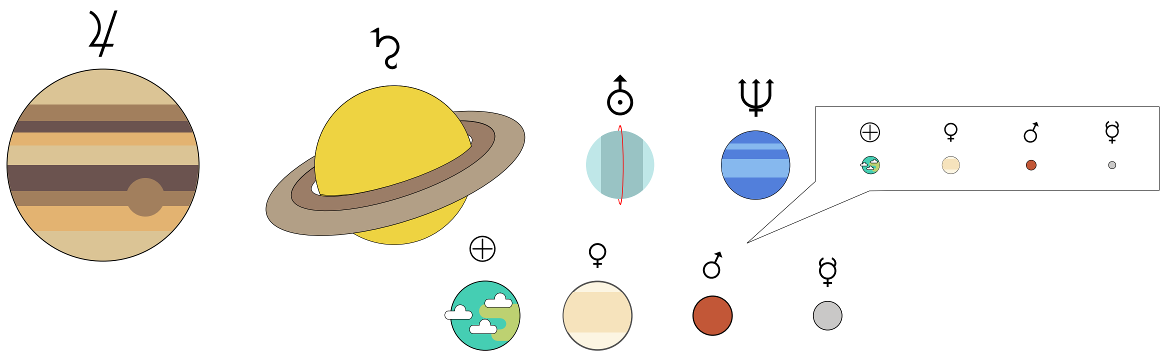

চিত্র B.১: Planet size comparison

সারণী B.৬: জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রায় ব্যবহৃত আকার সমূহ

Length (cm)	Comments	ব্যাখ্যা
10^{-33}	Planck Length	প্ল্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য
10^{-13}	Proton (neutron) Size	প্রোটন (নিউট্রনের) আকার
10^{-8}	Atomic Radius (Å)	মৌল ব্যাসার্ধ
10^{-4}	'Large' molecules	তুলনামূলক বড় অণু
10^{0}	Common Experience (1 cm)	সাধারণ দৈর্ঘ্য
10^{3}	Largest known living things	সবচেয়ে বড় জীবিত প্রাণী
10^{5}	Asteroid; Neutron Star	গ্রহাণু; নিউট্রন তারকা
10^{9}	Planet	গ্রহ
10^{11}	Star (sun)	তারা (সূর্য)
10^{14}	Red giant	লাল দানব তারা
10^{15}	Solar System	সৌরজগৎ
10^{18}	1 light year (ly)	১ আলোকবর্ষ
10^{21}	Globular Cluster (bound stars)	আবদ্ধ তারার গুচ্ছস্তবক
10^{23}	Galaxies	গ্যালাক্সি
10^{25}	Cluster of galaxies	গ্যালাক্সি গুচ্ছ
10^{28}	Size of Universe	মহাবিশ্বের আকার

সারণী B.৭: জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল

Time (s)	Comments	ব্যাখ্যা
10^{-43}	Planck Time ($\hbar G/c^5$)	প্ল্যাঙ্কের সময়
10^{-34}	Period of highest energy cosmic ray	সর্বোচ্চো শক্তির কসমিক রশ্মির আয়ু
10^{-21}	Period of typical nuclear gamma ray	নিউক্লীয় গামা রশ্মির আয়ু
10^{-15}	Typical electron orbital period	ইলেকট্রনের কক্ষপথের পর্যায়কাল
10^{-9}	H spin flip transition photon period	হাইড্রোজেন স্পিন ফ্লিপ স্থানান্তরকাল
10^{-3}	Audio	শ্রুতির সীমা
10^{0}	Common time perception	সাধারণ অনুভবের সময়
10^{5}	Bacteria, virus lifetimes	ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের জীবনকাল
10^{9-10}	Large mammals	বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনকাল
10^{13}	Largest Star lifetimes	বড় তারার জীবনকাল
10^{17-18}	Age of Universe	মহাবিশ্বের বয়স

সারণী B.৮: জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিভিন্ন রাশিতে গ্রিক বর্ণের ব্যবহার (বইয়ে)

α	Alpha	Right Ascension	ω	omega	Angular Speed, Argument of Periapsis
β	Beta	Ecliptic latitude, Speed as a fraction of light	ψ	psi	Wave function
γ	Gamma	Adiabatic Index, Stellar System (when used for velocity)	τ	Tau	Timescale, Half-life, Optical Depth
δ	delta	Declination, Small Change, Transit Depth	ϕ	Phi	Phase, Latitude, Azimuthal coordinate
ε	varepsilon	Emissivity	φ	varphi	Elongation
η	Eta	Efficiency, Mass fraction			
θ	theta	Arbitrary angle	Λ	Lambda	Cosmological Constant
κ	Kappa	Opacity	Σ	Sigma	Summation, Surface Brightness
λ	lambda	Wavelength, Ecliptic longitude, Length scale	Φ	Phi	Phase, Gravitational Potential, Photon Flux
μ	Mu	Distance Modulus (μ_d), Mean Molecular weight, Surface magnitude, Proper motion, Reduced Mass	Ω	Omega	Angular Speed, Density parameter, Solid angle, Longitude of ascending node
ν	Nu	Frequency, Neutrino	Π	Pi	Product, (Variable star) period
π	pi	3.14... Parallax angle [ϖ]	Ψ	Psi	Wave function, Phase angle
ρ	Rho	Mass density, Position angular distance	Δ	Delta	Change
σ	sigma	Stefan-Boltzmann constant, Cross section, Standard Deviation, Velocity Dispersion			

সারণী B.৯: জ্যোতির্বিজ্ঞানে হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিভিন্ন নাম ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য

Series Name	**Symbol**	**Transition**	**Wavelength (nm)**	**Medium**
Lyman	Lyα	$2 \leftrightarrow 1$	121.567	vacuum
	Lyβ	$3 \leftrightarrow 1$	102.572	vacuum
	Lyγ	$4 \leftrightarrow 1$	97.254	vacuum
	Ly_{limit}	$\infty \leftrightarrow 1$	91.18	vacuum
Balmer	Hα	$3 \leftrightarrow 2$	656.281	air
	Hβ	$4 \leftrightarrow 2$	486.134	air
	Hγ	$5 \leftrightarrow 2$	434.048	air
	Hδ	$6 \leftrightarrow 2$	410.175	air
	Hϵ	$7 \leftrightarrow 2$	397.007	air
	H_8	$8 \leftrightarrow 2$	388.905	air
	H_{limit}	$\infty \leftrightarrow 2$	364.6	air
Paschen	Paα	$4 \leftrightarrow 3$	1875.10	air
	Paβ	$5 \leftrightarrow 3$	1281.81	air
	Paγ	$6 \leftrightarrow 3$	1093.81	air
	Pa_{limit}	$7 \leftrightarrow 3$	820.4	air

সারণী B.১০: খ-গোলকীয় স্থানাংক ব্যবস্থা সমূহের সারাংশ

System	Coordinates	Interval
Equatorial	δ: declination α: right Ascension	$-90^\circ \leqslant \delta \leqslant +90^\circ$ $0^h \leqslant \alpha \leqslant 24^h$
Horizontal	a: altitude A: azimuth	$-90^\circ \leqslant a \leqslant +90^\circ$ $0^\circ \leqslant A \leqslant 360^\circ$
Equatorial Time	δ: declination H: hour angle	$-90^\circ \leqslant \delta \leqslant +90^\circ$ $0^h \leqslant H \leqslant 24^h$
Ecliptic	β: ecliptic latitude λ: ecliptic longitude	$-90^\circ \leqslant \beta \leqslant +90^\circ$ $0^\circ \leqslant \lambda \leqslant 360^\circ$
Galactic	B: galactic latitude L: galactic longitude	$-90^\circ \leqslant B \leqslant +90^\circ$ $0^\circ \leqslant L \leqslant 360^\circ$

সর্বোজ্জ্বল ২০ টি তারার তালিকা – List of 20 most brightest Star

সর্বোজ্জ্বল ২০ টি তারার এ তালিকায় কালপুরুষ, মহিষাসুর ও ত্রিশঙ্কু মণ্ডলের ২ টি করে তারা রয়েছে; বাকিদের রয়েছে ১ টি করে। তারার নামের সাথে আপাত ঔজ্জ্বল্য (Apparent Magnitude) এবং তারামণ্ডলের নামও সংযুক্ত হয়েছে।

তারার নাম	উপাধি	নাক্ষত্র মাত্রা	তারামণ্ডলের প্রচলিত নাম
Sirius (লুব্ধক)	α CMa	-১.৪৫	Canis Major the Big Dog
Canopus (অগস্ত্য)	α Car	-০.৭২	Carina the keel of Argo
Rigil-Kentaurus (জয়)	α Cen	-০.২৭	Centaurus the Centaur
Arcturus (স্বাতী)	α Boo	-০.০৪	Bootes the Shepherd
Vega (অভিজিৎ)	α Lyr	০.০৩	Lyra the Lyrae
Capella (ব্রহ্মহৃদয়)	α Aur	০.০৮	Auriga the Charioteer
Rigel (বাণরাজা)	β Ori	০.১২	Orion the Hunter
Procyon (প্রভাস)	α CMi	০.৩৪	Canis Minor Little Dog
Achernar (নদীমুখ)	α Eri	০.৪৬	Eridenus the River
Betelgeuse (আর্দ্রা)[a]	α Ori	০.৫০	Orion the Hunter
Hadar (বিজয়)	α Cen	০.৬১	Centaurus the Centaur
Acrux (বিশ্বামিত্র)	α Cru	০.৭৬	Crux the Southern Cross
Altair (শ্রবণা)	α Aql	০.৭৭	Aquila the Eagle
Aldebaran (রোহিণী)[b]	α Tau	০.৮৫	Taurus the Bull
Antares (জ্যেষ্ঠা)	α Sco	০.৯৬	Scorpius the Scorpion
Spica (চিত্রা)	α Vir	০.৯৮	Virgo the Virgin
Pollux (সোমতারা)	β Gem	১.১৪	Gemini the Twin
Fomalhaut (মৎস্যমুখ)	α PsA	১.১৬	Piscis Austrinus the Southern Fish
Deneb (পুচ্ছ)	α Cyg	১.২৫	Cygnus the Swan
Mimosa (—)[c]	β Cru	১.২৫	Crux the Southern Cross
Regulus (মঘা)	α Leo	১.৩৫	Leo the Lion

[a]আর্দ্রা (Betelgeuse) এর আপাত মাত্রা ২০১৯-২০২০ সালে হঠাৎ প্রায় ১ মাত্রা বেড়ে গেছিল।

[b]তালিকার ১৪, ১৫ এবং ১৬ অর্থাৎ রোহিণী, জ্যেষ্ঠা ও চিত্রা হলো অনিয়মিত বিষমতারা (Irregular Varriables) এর মানে হলো, সময়ে সময়ে এদের আপাত ঔজ্জ্বল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

[c]Crux বা ত্রিশঙ্কু মন্ডল ২০° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে মে মাসের দু'সপ্তাহ ব্যতীত দেখা যায় না বলে প্রায় সমস্ত তালিকায় আলফা ও বিটা-ক্রুসি (Acrux ও Mimosa) কে বাদ দেয়া হয়েছে (যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রসর প্রায় সব দেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত)। এ তালিকায় তারা দুটিকে যুক্ত করা হলো। Crux কে বাদ দিলে অন্য দুটি তারা হলো Canis Major এর Adhara (১.৫) এবং Gemini এর Castor (১.৫৮)।

আহা! বইয়ের আরেকটু অংশ (বা পুরোটাই!) প্রিভিউতে দেখা গেলে কত্তো মজা হতো, তাই না?
দুঃখজনক ভাবে এটা আমি করতে পারছি না। তবে তোমার যদি মনে হয় এই বই থেকে তুমি কিছু শিখতে পারবে, তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তাম্রলিপি প্রকাশনীর ফেসবুক পেজ কিংবা রকমারি থেকে প্রি-অর্ডার করে তুমি বইটি সংগ্রহ করতে পারো!

জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে তোমাকে স্বাগতম!

9 789849 996378